প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ২০২২

প্রমিতি মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

১৪২৯ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : নববর্ষ সংখ্যা : 2022

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
গদ্য		
শুভ নববর্ষ	জয়শ্রী বাগচী (দিল্লী, ভারত)	3
আমি বাংলায় গান গাই	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	4
জয়পুর ফুট	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	8
বসন্ত আওলো রে দে দোল দোল	গৌতম তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	11
মিঠি একটি শহরের নাম	সুশীল সাহা (কলকাতা, ভারত)	12
পাহাড়ি গোখরো	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	14
বাঙালির দেশপ্রেম ও চা	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	20
অধিকার	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	23
সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা	সংগ্রামী লাহিড়ী (পারসিপ্যানি, নিউ জার্সি)	24
সম্পর্ক	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	27
স্বর্ণচাঁপা	বৈশাখী চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	30
রক্তবীজ	অদিতি ঘোষদস্তিদার (মরিস প্লেইনস্, নিউ জার্সি)	52
মেক্সিকো – প্রথম প্রবাসে	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	53
জগন্নাথের জমি	নাট্যরূপ - সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	62
পিকচার প্যালেস	এস এস নেওয়াজ (স্যান অ্যান্টনিও, টেক্সাস)	68
নীরা	সোমা ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	70
অর্ডি-নারী	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	74
এলেম নতুন দেশে	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	82
অন্য আকাশ	সেতারা হাসান (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	86
কবিতা		
মনসঙ্গীত	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	33
ঋতুরাজ বসন্ত	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	33
স্বাধীন দেশে যুদ্ধ এল, বোঝে না তা ঠিক নয়	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	34, 50
শব্দের মেহেক	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	34
ভিখারী সন্ন্যাসীর আত্মকথা	গৌতম তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	35
আজীবন একুশে	আলী তারেক (হিউস্টন, টেক্সাস)	36
নারী দিবস, রবিবারের কাগজ	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	38, 43
অনুরণন, জীবনের ক্যানভাসে জলরং	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	38, 47
রূপসী সেই মেয়ে	আনন্দময়ী মজুমদার (কলকাতা, ভারত)	39
জলের শব্দ	পিয়াংকী মুখার্জী (কলকাতা,ভারত)	40
ঘুমজাগানি	দীপান্বিতা সরকার (মুম্বাই, ভারত)	41
খুচরো	সৌমি জানা (বেলমিড, নিউ জার্সি)	42
ঋণ	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	42
ঘরবন্দী মন	দীপশিখা চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	43
সবুজ ডিমের ডেভিল	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	44
দুঃখ দিতে চেয়েছ	বৈশাখী চক্রোত্তি (কলকাতা, ভারত)	46
শব্দ	মিশা চক্রবর্তী (হিউস্টন, টেক্সাস)	47
নীল, শুধু কিছু কবিতা রচনা হবে বলে, বৃষ্টি	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	48, 48, 49
মালাকার	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	49
যেতে হবে	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা,ভারত)	50
প্রেম ও মৃত্যু	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	51

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪২৯, এপ্রিল ২০২২

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র

প্রমিতি মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

সহযোগিতায়

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

অসিত কুমার সেন

আমাদের পত্রিকা

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হ’ল

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদনায়

মালবিকা চ্যাটার্জী

সুজয় দত্ত

সম্পাদকীয়

সব মলিনতা দূরে সরিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিই| পৃথিবীতে ক্রমাগত নানান ইতিহাস সৃষ্টি হতেই থাকে| সম্প্রতি যেমন আমরা দেখছি কোভিডের দোর্দন্ড প্রতাপ কমতেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের তান্ডবলীলা| দেখেছি মহামারীর কালচক্রে বহু মানুষের শেষ পরিণতি| এখন দেখছি ইউক্রেনের নিরীহ মানুষের অকারণ জীবন হানি হচ্ছে স্বৈরাচারীতার খামখেয়ালের জন্য| আমরা কি বহুদিন আগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি না! তবে কি আমরা জাগতিক নানারকম উন্নতির সঙ্গে কয়েক পা করে পিছন দিকেও হাঁটছি!
আমাদের রাগ, শোক, অপরাধবোধ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা – এই আবেগগুলিকে সরিয়ে রেখে যুদ্ধলিপ্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকানো অসম্ভব! অথচ কীভাবে এইসব আবেগ সামলে রেখে তারা তাদের দেশ বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিটি অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে সেটাও সত্যিই অবিশ্বাস্য! চোখের ওপর কত শত মানুষ, এমনকি অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং শিশু প্রাণ এই সাংঘাতিক নৃশংসতার শিকার হতে দেখেও ব্যক্তিগত ক্ষতির হিসেব করার সময় কই! প্রতিদিন নতুন নতুন অজানা নির্মম অত্যাচারের সঙ্গে যুঝে চলেছে ইউক্রেনের প্রতিটি সৈনিক| এই দুর্দান্ত অমানুষিকতার খেলায় মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নজিরও ছড়িয়ে আছে সর্বত্র; বহু মানুষ, বহু দেশ বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতার হাত|

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছে প্রমিতি মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৫)|
শ্রী প্রদীপ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমিতি|
প্রমিতিকে প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই|
প্রমিতির আঁকার মধ্যে খুঁজে পেলাম ইউক্রেনের মানুষের বাস্তুহারা হবার একটি সাদৃশ্য|
তাদের সুন্দর দেশ, তাদের ঘরবাড়ি, জীবনের সঞ্চয়, সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে রেখে তারা কেবলমাত্র সামান্য পুঁজি নিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য দেশে একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়| প্রমিতির ছবিতে ইউক্রেনের পতাকার রঙের আভাস থাকায় ছবিটি আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে|
যুদ্ধ কখনই সুখের হয় না; সরাসরি যুদ্ধে জড়িত না থাকলেও মানুষের মন অবসাদে ছেয়ে থাকে|
গুরুদেবের ভাষায় –
“নব আনন্দে জাগো আজি নব রবিকিরণে...”
আশা রাখি অন্ধকার কাটিয়ে আমরা নব আনন্দে জেগে উঠতে পারব নতুন আলোর পথ বেয়ে|
পত্রিকায় সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহযোগীদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই|
বাংলা নতুন বছরে সকলের জীবন আনন্দে ভরে উঠুক|
মালবিকা চ্যাটার্জী

শুভ নববর্ষ

জয়শ্রী বাগচী

আজ বৈশাখের প্রথম দিন, বাংলা বছরের জন্মদিবস| জানি না কে কবে ঠিক করে দিল বছরের জন্মের এই হিসেব-নিকেশ| ভাবছিলাম জরাগ্রস্ত শীতে জীর্ণ খসেপড়া প্রকৃতিকে আবার নবপ্রাণ সঞ্চারের রসদ যুগিয়ে যৌবনমদমত্ত করে তোলে যে বসন্ত, যে ঋতুরাজ – তাকেও তো নতুন বছরের তকমা দেওয়া যেতে পারত, রুক্ষ-শুষ্ক এই দিনগুলোর বদলে|

আসলে স্থানান্তরে লোকাচারে আমরা নিজেরাই সুবিধামতো ঠিক করে নিয়েছি বছরের শেষ ও শুরুর হিসেবটুকু| এছাড়াও পৃথিবীর চাঁদ-সূর্য-তারাদের চারিপাশে ঘোরাফেরা, জোয়ার ভাঁটার টানাপোড়েন, সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা এসব হিসেব অনেক আছে| থাক সেসব তাত্ত্বিকদের তত্ত্বকথা – মোট কথা হ'ল চৈত্র শেষে আবার এসেছে বৈশাখ তার রুদ্র ভেরী বাজিয়ে গতানুগতিক একই প্রথায়|

এ রাজ্যে অবশ্য প্রতিবারই বসন্তের রেশ মাখানো আসরে শিমুল, পলাশ, কোকিলের রাজত্বেই চুপিচুপি একটু একটু করে ঢুকে পড়ে বৈশাখ – তার রুদ্র বেশ নিয়ে নয়, কিছুটা যেন শেষ বসন্তের আমেজটুকু গায়ে মেখেই|

এবার কিন্তু অন্যরকম –

চৈত্রের শেষ সন্ধ্যায় সবাই যখন উদাসী হাওয়ায় সুবাসিত নিমফুলের মনকেমন করা নির্যাসে বুঁদ হয়ে সান্ধ্য ভ্রমণটুকু সেরে ফেলতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই কালবৈশাখীর এক উন্মত্ত ঝটকা ধূলিধূসরিত হয়ে, চারিদিকের শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা জ্যোৎস্নাকে ম্লান করে তার আগমনী সুর শুনিয়ে গেল হঠাৎই|

সবাই ত্রস্তপায়ে ঘরে ফিরে বললাম ওই তো বৈশাখী বার্তা এসে গেছে, রাত ফুরোলেই নতুন বছরের আরো এক জন্মদিন!

ভাবছিলাম তবে কি এবার এই দাপটেই পৃথিবী নিরাময় হবে, সব পাপ তাপ ধুয়ে মুছে যুদ্ধের দামামা থেমে যাবে, রাজনীতির চুলোচুলি ভুলে ছোট-বড় এক হয়ে বলে উঠতে পারব –

"বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি"

এবার নাহয় এই আশাতেই নববর্ষ বরিত হোক দিকে দিকে, দেশে দেশে, বিশ্বের চরাচরে!

আমি বাংলায় গান গাই

হুসনে জাহান

“তাই তাই তাই মামাবাড়ি যাই”, “আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা” – আমাদের গুরুজনরা কেউ না কেউ এসব ছেলেভুলানো গান গেয়ে শিশুকালে আমাদের শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। দুই বাংলায় কোনও পরিবারে এমন নিদর্শন নেই বলে আমার জানা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষায় শিশুদের শান্ত করবার জন্য এরকম ছেলেভুলানো ছড়া ও গান মা, ঠাকুমা-দিদিমা গেয়ে থাকেন।

আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। আজীবন শিক্ষকতা করেছি। তবে লেখালেখির সময় ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃ-ভাষাও ব্যবহার করেছি। হিন্দি ও উর্দু (কিছু স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গের ভুলসহ) ভাষাতেও অবিরাম কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারি কারণ কলকাতার স্কুলে আমি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু পড়েছিলাম। উর্দু এবং বাংলা জানলে হিন্দি বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিছু ফার্সি, স্প্যানিশ ভাষাও শেখার এবং কথা বলার সুযোগও হয়েছিল ওসব দেশে কিছুদিন বসবাস করে। তবে সত্যি বলতে কি – যে কোনো মুহূর্তে মাতৃভাষা ব্যবহার করবার সুযোগ আমি কিছুতেই হাতছাড়া করি না। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য দেশের ভাষায় কি মন খুলে গল্পগুজব করা যায়? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আমাদের বাংলার অতি পরিচিত এক শব্দ ‘অভিমান’। অভিমান বলতে যে অনুভূতি বোঝায়, তা অন্য কোনো ভাষায় কি সঠিকভাবে বোঝানো যায়? এমনই আরো কিছু বাংলা শব্দের সঠিক অর্থ অন্য কোনো ভাষায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। তেমনই ইংরেজি বা অন্য ভাষারও কিছু শব্দের সম্পূর্ণ ভাবার্থ অন্য ভাষায় পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

আমি মনেপ্রাণে একজন ভেতো বাঙালি। অন্তত একবেলা ভাত-তরকারি না খেলে মনে হয় যেন ঠিকমতো খাওয়াই হয়নি। বারো মাসে বাংলায় বিভিন্ন ঋতুতে বাংলা গান, কবিতার মাধ্যমে উৎসব, পার্বণ উদযাপন করে আনন্দ পাই; এবং অন্য বাঙালিদের সাথে উপভোগ করবার সুযোগ খুঁজি। তাই মাতৃভাষা বলবার সুযোগ পেলে যেন আপনজন পেয়ে গেছি মনে হয়।

আমার ছোট্ট দুই নাতির বাংলা শেখার অভিজ্ঞতার কথা বলি। তাদের বাবা দেশে থাকতেই বাংলা বলতে ও পড়তে শিখেছে। তবে তার স্ত্রী বাঙালি না হওয়ায় ইংরেজি তাদের পারিবারিক কথাবার্তার ভাষা। আমার ছেলে নানান কাজে ব্যস্ত; ইচ্ছা সত্ত্বেও তার সন্তানদের বাংলা শেখানোর সুযোগ হয় না। তাই বাংলা শেখাবার জন্য এক বাঙালি মহিলার সাথে ব্যবস্থা করা হ’ল। প্রতি শনিবার শিক্ষকের বাসায় প্রাইভেট ক্লাস। নাতির বয়স তখন পাঁচ। আমি তখন ঢাকায় চাকুরিরত। মাসখানেক পর জানলাম ছেলের বাংলা শিক্ষার ইতি হয়ে গেছে। তারপর আর তাকে বাংলা শেখানো সম্ভব হয়নি।

এর ৬ বছর পর তার চার বছর বয়সী ছোট ভাইকে বাবার আবার বাংলা শেখাবার ইচ্ছা হ’ল। ইন্টারনেট ঘেঁটে আরেক বাঙালি মহিলা পাওয়া গেল। আমি সে সময় ছুটি কাটাতে তাদের কাছে এসেছি। প্রথম দিন আমাকেও শিক্ষকের বাসায় নিয়ে গেল। আমাকে বাইরের ঘরে অপেক্ষায় বসিয়ে শিক্ষক ছাত্রকে খাতা-পেন্সিলসহ অন্দরমহলে নিয়ে গেল। ছেলের বাবা তার কাজে চলে গেল।

ঘন্টাখানেক পর খাতা পেন্সিল হাতে নাতি গম্ভীর মুখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কেমন লেগেছে জানতে চাইলে মাথা নেড়ে ‘ঠিক আছে’ জানিয়ে হাতের খাতা এগিয়ে দিল। দেখলাম খাতার প্রথম তিন পাতা শিক্ষকের হাতে লেখা বাংলার পারিবারিক ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক শব্দ এবং তার পাশাপাশি ইংরেজী প্রতিশব্দ। এ সব নাকি পরের সপ্তাহের ক্লাসের জন্য শিখে আসতে হবে। সারা সপ্তাহ নাতি আমার কাছে সে ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করল না। আমিও তার বিরক্তি উদ্রেক করা উচিত নয় মনে করে কোনো প্রশ্ন করলাম না। এক সপ্তাহ পর ক্লাসের দিন শুনলাম নাতির নাকি পেটে ব্যথা, তাই বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। ব্যস, হয়ে গেল; এ নাতিরও এখানেই বাংলা শেখার ইতি।

এর পর আমি ঢাকা থেকে আর একটু ঘন ঘন আসবার সুযোগ পেয়ে বাংলা ছড়ার বই, ক্যাসেট, বর্ণমালা ইত্যাদি এনে তাকে শোনাতাম। সে খুব গান, গল্প ও কবিতা ভালবাসত। আমি দেশে চলে গেলে তার বাবা বাংলায় তার সাথে কিছু কথাবার্তাও বলার চেষ্টা করত। সেই থেকে অন্যান্য ভাষা শেখার সাথে সে বাংলা কথা বলতে শুরু করল। এখন আমার সাথে সে

বাংলাতেই কথা বলা পছন্দ করে| আমার যে কী ভাল লাগে কী বলব!

আমার ছাত্রাবস্থা মাতৃভাষা রক্ষার উদ্দেশ্যে সহপাঠী ছাত্রদলের রক্তাক্ত মৃত্যু বরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী | সেই সঙ্গে নির্ভীক ছাত্রীদলও সহপাঠীদের সমর্থনে বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে এসেছিল | সেই মর্মান্তিক রক্তপাতের স্মরণে প্রতিবছর সারা দেশ জুড়ে বাঙালি জাতি ভাষা-সৈনিকদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোরের সূর্য ওঠার সাথে নগ্নপায়ে হেঁটে কাতারে কাতারে প্রভাত ফেরিতে বেরিয়ে মৃতদের স্মৃতিসৌধে মাল্যদান করে|

অবশেষে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সংস্থা সেসব আত্মত্যাগী ছাত্রদের বলিদানের স্মরণে সেই বিশেষ দিনটিকে (২১শে ফেব্রুয়ারী) “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” নামে স্বীকৃতি দিয়েছে | এটা শুধুই বাংলাভাষার স্বীকৃতি নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মাতৃভাষার জন্যই এক মহান গৌরব|

আসলে যে কোনও মাতৃভাষার সাথে অন্য কোনো বিদেশী ভাষার কখনই তুলনা হয় না | যে ভাষায় আমাদের স্নেহময়ী মায়েরা কথা বলেছে, গান করেছে, শাসন এবং আদর করেছে, তার সাথে কি অন্য কোনো ভাষার তুলনা করা যেতে পারে?

ভাষার কথা আলোচনা করলে কৌতূহলী মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আসলে ‘ভাষা’ বলতে আমরা কী বুঝি এবং এর উৎপত্তি কোথায় এবং কীভাবে? আমি ভাষা বিজ্ঞানী নই, তবু এ প্রশ্ন মনের কোণে অবশ্যই উঁকিঝুঁকি দেয়| মানুষ কেন এবং কবে থেকে কথা বলা শুরু করেছে? আর মানুষই কি একমাত্র জীব, যে নিজের মনোভাব ও চাহিদা প্রকাশ করতে ও কাজকর্ম চালানোর উদ্দেশ্যে ভাষার সৃষ্টি করেছে?

আমরা কেন কথা বলি এ প্রশ্নের উত্তর সবারই জানা| তবে কবে ও কীভাবে সে ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার সেসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর গবেষকরা উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন| তারপর প্রশ্ন ওঠে মানুষ কি প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর থেকেই ভাষা ব্যবহার করছে?

আমরা জানি, অন্যান্য পশু পাখিরাও বিভিন্ন ধ্বনিদ্বারা নিজেদের ব্যক্ত করে | সেসব ধ্বনি বিশ্লেষণযোগ্য কিনা এবং মানুষের ভাষার পাশাপাশি সেগুলো কতটুকু বোধগম্য ও তুলনীয় তা পশুপাখির ভাষা গবেষকরাই বলতে পারেন|

আমরা ছোটবেলা থেকে পাখির কলকাকলি উপভোগ করছি | গাছের নিচে বসে পাখির কাকলি শুনতে, তাদের চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গি, হাবভাব, দেখে সে সবের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি | এমনকি তাদের স্বরও অনুকরণ করে তাদের বিরক্তি ও উষ্মা জাগিয়ে দারুণ উপভোগ করি না কি? বসন্তের ‘কোকিল’, ‘বৌ কথা কও’, ‘চোখ গেল’, ‘ইষ্টি কুটুম’ এ সব বাঙালির অতি পরিচিত পাখি|

গৃহজাত প্রাণী বিড়াল, কুকুর, গরু, ছাগল, মোরগ, পাতিহাঁস, রাজহাঁস সবাই তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন বোঝাবার জন্য বিভিন্ন অর্থপূর্ণ স্বর ও ধ্বনি ব্যবহার করে| সেসব ধ্বনি কান পেতে শুনে তাদের নড়াচড়া, কার্যকলাপের সাথে মিলিয়ে তাদের অভিযোগ, চাহিদা, সন্তোষ, অসন্তোষ কিছুটা অনুমান করা যায়| তাই একথা মনে করা যায় যে পশুপাখির বিভিন্ন স্বর তাদের জীবনের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থপূর্ণ| তবে আবেগ ও অন্যান্য অনুভূতি মানুষ যেভাবে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে, তার তুলনায় অন্যান্য জীবের বহিঃপ্রকাশ অনেক অংশে সীমিত| এ কারণেই মানুষের ভাষার বহিঃপ্রকাশ অন্যান্য প্রাণীর শব্দধ্বনির চাইতে অনেক ভিন্ন, উন্নত এবং জটিল|

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভাষা তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার আদান-প্রদানের এক মাপকাঠি| বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মানব জাতির আগমনের প্রথম অধ্যায়ে মানুষও সম্ভবত পশুপাখির মতোই আকার ইঙ্গিত এবং ন্যূনতম ধ্বনি ব্যবহার করে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে| এর পর বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে এবং অন্যান্য উপাদানের উপর আঁকজোক করে নিজেদের ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছে | এইভাবে ক্রমবর্ধমান স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মানুষের ভাষা ধাপে ধাপে উন্নত ও পরিবর্তিত হয়ে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে | আর এই আধুনিক যুগে মানুষের সামাজিক ও আন্তর্জাতিক যাতায়াত ও মেলামেশার দরুন বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে বিভিন্ন রূপে ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং বিস্তার লাভ করেছে|

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে ও পরে বেশ কয়েক বছর আমি বিদেশে অবস্থান করেছি | তবে বাংলা প্রদেশে আমার

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর (যাকে আজকাল হাই স্কুল বলা হয়) ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে হলেও সিলেবাসের দুই পেপারের একটা বিষয় হিসাবে বাংলা বাধ্যতামূলক ছিল। আর বাবা-মা ও স্বামীর বংশের সকলেই বাংলাভাষী।

কয়েক বছর বিদেশে অবস্থানের পর দেশে ফিরে স্বাধীন বাংলার জাতীয় ভাষার মোকাবিলা করতে হয়েছে। পরিবারে এবং সমাজে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারী ভাষার পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। প্রথম দিকে তো বাংলা পত্রিকার খটমটে ভাষা পড়ে বুঝতেই দারুণ সমস্যা হতো। এক একটি শব্দ বুঝে পড়তে অনেক সময় লেগে যেত। রেডিও ও টিভির খবর শুনতে বসে তো আরো কেলেঙ্কারি! খবর পরিবেশক প্রথম লাইন পড়া শেষ করে দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছে গেছে, আমি তখনও খবরের প্রথম লাইনের মর্ম উদ্ধারে ব্যস্ত। ছাপা খবর তবু বার বার পড়ে বোঝা সম্ভব; কিন্তু টেলিভিশন অথবা রেডিওর পরিবেশক তো আমার বুঝবার গতির অপেক্ষায় বসে থাকছে না। আমি কি তাহলে বাংলা ভুলে গেলাম নাকি? পরে বুঝলাম এর কারণ আমার স্বাধীন দেশের নতুন ভাষার মাঝে বিভিন্ন নতুন শব্দের অবতারণা। স্বাধীন বাংলাদেশে সব বিদেশী শব্দ বর্জন করে স্বদেশী প্রতিশব্দ তৈরী করে ব্যবহারের প্রচেষ্টাই এর জন্য দায়ী।

এই ব্যাপারে আমার দুটো অসুবিধা মোকাবিলার কাহিনী – আমার এক সহকর্মী কোনো কোনো দিন অফিসের কাজ শেষে আমাকে যানবাহনের জন্য অপেক্ষারত দেখলে করুণাবশত তাঁর গাড়িতে মোটর রিকশার মোড় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতেন। তিনি একদিন আমাকে আমার বাসস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাঁর নতুন কর্মসংস্থার এক বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক শব্দযুক্ত বিরাট থিসিসের পাণ্ডুলিপি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবার জন্য আমার হাতে গুঁজে দিলেন। তাও মাত্র এক সপ্তাহের মেয়াদে শেষ করতে হবে। আমার তো মাথায় বাজ পড়ল! কী আর বলি, তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি যখন, তখন তার দাম তো দিতেই হবে! সে এক ইয়া বিরাট হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি এবং অবশ্যই আধুনিক বাংলা শব্দচয়নে ভরা। তাও আবার নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।

পাতা উল্টিয়ে দেখা গেল আগাগোড়া ইংরেজির নতুন বাংলা প্রতিশব্দ। প্রথমে সেসব শব্দের অর্থ বুঝে তবে তো ইংরেজি-করণ! ইংরেজি এবং বাংলা দু'ভাষাতেই এবার আমার কেরামতি ফাঁস হয়ে যাবে যে! দিনরাত বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান নিয়ে বসে এবং কিছু বঙ্গবাসী বন্ধুদের সাহায্য নিয়েও এক সপ্তাহে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারা গেল না। নিরুপায় হয়ে আমার গাড়ি চড়ানোর হিতৈষীর কাছে এক মাসের সময় দাবি করলাম। সাহস করে বলে দিলাম, আরো সময় না পেলে আমার দ্বারা একাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। অবশেষে তিন সপ্তাহের অঙ্গীকারে রফা হ'ল। সেই সঙ্গে কিছু বাংলা শব্দ ইংরেজিতেই রক্ষা করে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে নিষ্পত্তি করা গেল।

তাহলে আমার এই অনুবাদ করার সমস্যার আসল কারণটা কী? সেটা হ'ল স্বাধীন বাংলায় যথাসম্ভব ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সরকারী লেখালেখিতে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত। যেমন টিভি হ'ল 'দূর দর্শন', টেলিফোন 'দূর আলাপনী', এরোপ্লেন 'বিমান' এরকম আরো অনেক দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার।

এই প্রসঙ্গে আরেক ঘটনার কথাও মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংস্থা পরের সপ্তাহেই এক বিদেশী শিক্ষকের সাথে ৫ দিনের জন্য দোভাষীর দায়িত্ব নেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানাল। একটু ঘাবড়ে গেলাম, কারণ আমি জানি ইন্টারপ্রেটারের কাজে চোখ, কান, মস্তিষ্ক একসাথে পুরোপুরি সজাগ ও সক্রিয় রাখতে হয়। আমি চিরদিনই ধীরে সুস্থে সুষ্ঠু ও সুচিন্তিতভাবে কাজ করা পছন্দ করি। কাজটার পারিশ্রমিক ছিল লোভনীয়, আর ৫ দিন একটা সুন্দর গেস্ট হাউসে থাকা খাওয়া, শহর থেকে দূরে। কাজেই সম্মতি জানিয়ে দিলাম। আন্তর্জাতিক সংস্থা চুক্তিনামা ও বিষয়বস্তুর ওপর বাংলাদেশের দুস্থ মহিলাদের পরিস্থিতি ও সমস্যার ওপর রিসার্চের এক মোটা সংকলন পাঠিয়ে দিল। বিষয়বস্তু ও তার ভাষার বহর দেখে তো আমার মাথা ঘুরে গেল। বিষয়বস্তুর সাথে মোটামুটি একটু জ্ঞান থাকলেও তার বিস্তারিত বিবরণসহ নতুন সরকারী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রীদের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে পেশ করা বেশ কঠিন কাজ বলে মনে হ'ল। তাছাড়া এই বই হবে বাংলাদেশের রিসার্চ বিষয়ক সংকলন। আর বিদেশী শিক্ষক ইংরেজিতে কোনদিন তাঁর বক্তব্য কীভাবে উপস্থাপন করবেন তাও তো আমার অজানা।

জীবনের বাকি সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে অভিধান নিয়ে

অনুবাদ করতে বসে গেলাম। আমার স্বামীও যথাযথ সাহায্য করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু লিখিত অনুবাদ করেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, সারমর্মটা সাহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন। কোনমতে প্রথম দু-তিন অধ্যায় অনুবাদ করলাম। সেগুলো বার বার পড়ে ক্লাসে গেলাম। ওরে বাবা, দেখি শিক্ষক তো তুবড়ির মতো ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখলাম। আমি যে শুধু বইয়ের বিষয়বস্তু থেকেই অনুবাদ করেছি। বক্তার নিজস্ব কথার জন্য তো আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া তিনিও আমার অনুবাদের গতির জন্য অপেক্ষা করছেন না। এখন কী করি! তাঁর বক্তব্য থেকে বেশিটা, আর বাকিটা নিজের ভাবনা থেকে নিয়ে কোনোমতে গোঁজামিল দিয়ে সেদিনের ডিউটি শেষ করলাম।

এখানে বলে নিই যে অংশগ্রহণকারীরা সবাই বিভিন্ন বাংলাদেশী সংস্থায় এই বিষয়বস্তুর উপরই কাজে নিযুক্ত। বাংলা ভাষাতেই তারা সব কাজকর্ম করে; সুতরাং বিদেশী গবেষকের কথা বোঝার জন্য দোভাষী ইন্টারপ্রেটারের প্রয়োজন।

রাতে ডিনারের সময় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বসলে তারা আমার অসুবিধা বুঝতে পেরে পরামর্শ দিল যে নতুন ও কঠিন শব্দগুলো ইংরেজিতেই ধরে রেখে সারর্মর্মটা বাংলায় বুঝিয়ে দিলেই চলবে। কারণ ওসব ইংরেজি শব্দ তারাও ব্যবহার করে এবং বুঝতে পারে। তাদের প্রস্তাব শুনে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম!

পরদিন বিদেশী শিক্ষক যখন দ্রুতগতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে চললেন, আমি বাক্যের মূল গতি বাংলায় রেখে ইংরেজি শব্দগুলো ইংরেজিতেই পেশ করলাম। এবার আর কোনও সমস্যায় পড়তে হ'ল না। অংশগ্রহণকারীরাও সন্তুষ্ট মনেই তা গ্রহণ করল। আসল কথা বোঝা গেল যে যদিও তারা সবাই বাঙালি এবং বাংলা ভাষাতেই পড়াশোনা করেছে, কিন্তু ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর সাথে সকলেই পরিচিত। তারাও সেসব শব্দ অহরহ ব্যবহার করে, কাজেই তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫ দিনের কর্মকাণ্ডের শেষ দিনে ছাত্রীরা এবং বিদেশী শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে আমার অনুবাদের প্রশংসা করল।

এর পর এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। ভাল অনুবাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করে সে রাতে বাসায় ফিরে এলে আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাকে টেলিফোনে আবার অনুরোধ করল পরের দিন শেরাটন হোটেলে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা চলাকালীন অনুবাদক হিসাবে দায়িত্ব নেবার জন্য। আবার! তাও বক্তৃতা চলাকালীন? না বাবা, অত লোভনীয় পারিশ্রমিকের আমার প্রয়োজন নেই। জীবনটা শান্তিতে কাটানোই কাম্য।

মাঝে মাঝে ভাবি, ইন্টারপ্রেটাররা কি সত্যিই ভাষার সারমর্ম বক্তৃতার সাথে সাথেই হুবহু অনুবাদ করে বলতে পারে; নাকি যে কথা সে হারিয়ে ফেলে, সেগুলো নিজের মনগড়া কথা দিয়ে পূরণ করে? যাই হোক, ও কাজে না গেলে সে প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব হবে না।

এপর্যন্ত তো স্বাধীন বাংলার সরকারী ভাষার গল্প বললাম। এবার আরেকটি নতুন বাংলার বেসরকারী ভাষার মজার গল্প বলি – আমি এক সময় অফিসে এক দশ বছর বয়সী ছোট্ট প্রাইভেট পিয়ন রেখেছিলাম। মানে, ওর মা কাজে যাবার সময় আমার কাছে ওকে রেখে যেত। আমি তাকে আমার অফিসে বসিয়ে রাখতাম। সে একদিন এক ঘটনার পর আমাকে বলল, "খালাম্মা, ওই ছেড়াগুলা (ছেলেগুলো) পাড়ার মাইয়াগো সাথে লাইন লাগাইসে।" এ কথার মানে বুঝতে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে হ'ল। সে মুচকি হেসে মুখে কাপড়ে ঢেকে "ওমা, খালাম্মা, আপনে লাইন লাগানো বুঝেন না?" বলে লজ্জায় আমার সামনে থেকে সরে পড়ল। পরে অন্য একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমি সেই কথার মানে জানতে পারি। শুনে আমার চোখদুটো উঠে গেল একেবারে চড়ক গাছে। বলে কী এই ছোট্ট নিষ্পাপ বালিকা! আজও আমি এইসব শব্দগুলোর মানে বুঝতে গিয়ে ঠোক্কর খাই।

এমন করেই ভাষা ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে চলে। ভাষার প্রাচীন রূপ নতুন দেশের ও নতুন যুগের ভাষা ও সংস্কৃতি সংযোগে সমৃদ্ধ হয়ে রকমারি রূপ ধারণ করবে এটাই যুক্তিসঙ্গত। তাকে জোর করে পুরনো ধাঁচে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় আর সমীচীনও নয়; কেননা, সমাজের অগ্রগতির সাথে সামাজিক সব বিধি ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে ভাষার পরিবর্তনও স্বাভাবিক।

আজকের যুগে প্রবাসী বাঙালি ঘরের কিছু ছেলেমেয়ে বাংলায় কথা বলতে বা বুঝতে অনিচ্ছুক। এ অবস্থার জন্য

ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের পরিবেশ ও অভিভাবকরাও দায়ী, কারণ সব শিক্ষার সর্বোচ্চ হাতেখড়ি হয় বাবা-মা'র কাছে। অনেকের ধারণা শিশুকে একটির অধিক ভাষা একত্রে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে শিশু বিব্রত বোধ করে। তাতে করে সে কোনও ভাষাই মনোযোগের সাথে আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে শিশু মুখ ফুটে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করে, আর কথা বলা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীরা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে শিশুর স্বাভাবিক সতেজ ও সক্রিয় মস্তিষ্ক অতি দ্রুত একের অধিক শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম।

আমি আশেপাশের কিছু ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইরানি, বসনিয়ান, সোমালীয়, ইথিয়োপীয়ান, চীনদেশীয় ও স্প্যানিশ ভাষী পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ করেছি যে তারা স্কুলে অথবা প্রতিবেশীদের সাথে ইংরেজি ভাষায় বেশ পারদর্শিতার সাথেই কথাবার্তা বলবার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব মাতৃ-ভাষাতেও পুরোপুরি দখল রেখে চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাদের ইংরেজি ভাষায় আনাড়ি অভিভাবকদের জন্য তারাই বাহির বিশ্বে অবৈতনিক পারিবারিক ইন্টারপ্রেটারের কাজ করে সেই ঘাটতি পূরণ করে।

আমার এই বক্তব্যের সারমর্ম হ'ল, নিজের মাতৃভাষা কারুরই কখনো বর্জন করা কাম্য নয়। যে কোনো নতুন ভাষা শিখতে আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। তারপরও সম্ভবত অনেকেই মাতৃভাষার মতো সহজে ও সাবলীলভাবে সে ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না। তাই মাতৃভাষাকে ঠেলে ফেলে না দিয়ে সযতনে পালন করলে কোনও কুফল হবে না, বরং গর্বের কারণ হতে পারবে এই ভেবে যে নিজের মাতৃভাষাকে পর্যাপ্ত সম্মান দিতে পেরেছি।

জয়পুর ফুট

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হঠাৎ অমলের সঙ্গে দেখা। গোবিন্দ মিত্র রোডের ওপর দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। পরনে একটা মোটা ধুতি, আর ডোরাকাটা ছিটের জামা। মুখ শুকনো, চুল উস্কোখুস্কো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। "অমল, অমল" বলে জোরে চেঁচাতে সে মুখ ঘুরিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

- "বিশু তুই! তুই তো কোথায় বম্বে টম্বেতে পড়াশোনা করিস!"

- "তা বলে কি বাড়িতে আসতে নেই? ভুলে গেলি পাটনাতেই আমার ভিটে? এ কী চেহারা করেছিস তুই?"

- "তাড়া আছে রে, নিচলকির বস্তিতে একটি সাত বছরের ছেলে ওলাওঠায় মারা যাচ্ছে। আই ভি স্যালাইন নিয়ে ছুটছি।" বলে সে এগিয়ে গেল।

- "চল, আমিও যাব তোর মানব সেবায় সাহায্য করতে।"

আই ভি চড়াতে চড়াতেই ছেলেটি দুবার থরথর করে কেঁপে মারা গেল। এতরকম মৃত্যু দেখেও অমল এখনও বেশ দুর্বলচেতা। তার চোখদুটো জলে চিকচিক করে উঠল।

- "ছেলেটা বাঁচল না রে!"

- "দেখ, ভগবানের ওপর তো কারো হাত নেই; তুই তো চেষ্টা করেছিলি।"

মা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে পাথর হয়ে বসে আছে। আমাদের দুজনের পকেটে যা সামান্য টাকাকড়ি ছিল সেগুলো তার সামনে রেখে বেরিয়ে এলাম।

- "অমল, মানুষ সেবার জন্য যতটা স্পৃহা দরকার তার চেয়েও বেশি দরকার ডাক্তারি জ্ঞান। তুই একজন মেধাবী ছাত্র; মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে, ডাক্তার তৈরী হয়ে জনমানবের সেবা কর।"

এই অবান্তর জ্ঞান বিতরণ করে সেবারের মতন বিদায়।

তিন-চার বছর কেটে গেছে। যে যার নিজের জীবন স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি। অন্যের খবর নেবার সময় বা সুযোগ দুটোই নেই।

দাদা দ্বারভাঙ্গায় বদলি হয়ে গেছে। 'বিহার মিনিস্ট্রি অফ্ হেলথ্' দাদাকে পাঠিয়েছে নর্থ বিহারে অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্ট স্থাপন

করার জন্য। তখনও 'গান্ধীপুল' তৈরী হয়নি। পাটনা থেকে দ্বারভাঙ্গা যাবার মাত্র দুটো উপায় – একটি দুর্গম, অন্যটি বন্ধুর। একটা পথ – পাটনা থেকে মোকাম জংশনে নেমে ন্যারোগেজ লাইনের ট্রেন নিয়ে গঙ্গা পার করা। তারপর অযান্ত্রিক বাসে দ্বারভাঙ্গা। দ্বিতীয় পথ – মহেন্দ্রু ঘাট থেকে কার (car) কম্পানির স্টিমারে চর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গঙ্গা পার হয়ে সোনপুর স্টেশন। সোনপুর স্টেশন থেকে শিথিলগামী ট্রেনে লাহেরিয়াসরাই। সেখান থেকে টমটম চেপে দ্বারভাঙ্গা।

দাদু বলতেন – 'দ্বার বঙ্গ' অপভ্রংশ হয়ে নাকি 'দ্বারভাঙ্গা' নামকরণ হয়েছে। আজ পর্যন্ত সেটা তলিয়ে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

পুজোর ছুটিতে পাটনা হয়ে দ্বারভাঙ্গা যাচ্ছি দাদার কাছে। স্টিমারে আবার অমলের সঙ্গে দেখা।

- "এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?" জিজ্ঞেস করলাম।

- "দ্বারভাঙ্গা থেকে ২৫ মাইল দূরে এক গ্রামে BDO-র চাকরি করি।"

- "ডাক্তারি পড়ছিলি খবর পেয়েছিলাম।"

- "আর, শেষ করতে পারলাম কোথায়! অশোক রাজপথে বাবার বইয়ের দোকান ছিল। আগুন লেগে সব শেষ। ফি দিতে পারলাম না। সেকেন্ড ইয়ারে MBBS ছেড়ে কম্পাউণ্ডারি স্কুলে ভর্তি হলাম – সংসার চালাতে হবে তো!"

- "মাসিমা-মেসোমশাই কোথায় এখন?"

- "পাটনাতেই আছেন। ভিটেবাড়িটা বিক্রি করে ভাড়াবাড়িতে থাকেন। বাবার আর মানসিক বা শারীরিক জোর নেই নতুন করে কিছু শুরু করার।"

- "চল, তোর কাছে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে আসি। গানের চর্চা করিস তো? তোর গান শুনব, আর তোর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সময়টা ভালই কাটবে।"

- "না রে, তুই আমার ঝুপড়িতে থাকতে পারবি না। বৃষ্টি হলে চাল থেকে জল পড়ে। একটা বারো বছরের অনাথ খোঁড়া ছেলে আমার দেখাশোনা করে। ছেলেটার নাম শহীদ। কোনদিন ভাত রাঁধে একেবারে কাঁচা, আবার কোনদিন পোড়া। বকাবকি করলে সে দাওয়ায় বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এসবে তোর বড্ড কষ্ট হবে রে। তোর দাদার প্রাসাদ ছেড়ে আমার ঝুপড়িতে থেকে কেন ছুটিটা মাটি করবি তুই?"

কোনো কথা শুনিনি। পুকুরের ধারে অমলের ঝুপড়ি। একখানা ঘর, আর দাওয়ার এক কোণে একটা রান্নার জায়গা। ইলেক্ট্রিসিটি বা কলের জলের কোনও বালাই নেই। হ্যারিকেনের আলো আর পুকুরের জল। শহীদকে দেখলাম – গায়ের রং চকচকে কালো। ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে অ্যাম্পিউট করা, একটা লাঠিতে ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে সে। কোনও অভিযোগ নেই। ঘুড়ি ওড়াতে আর ফুটবল খেলতে খুব ভালবাসে। দিনরাত্রি অমলের কাছেই পড়ে থাকে। ডাক্তারবাবু নাকি তাকে নকল পা করিয়ে দেবেন; ঠিক যেমনটি জমিদারবাবুর ছোটছেলের আছে। সে ছেলে গটগটিয়ে হাঁটে, টগবগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, দুমদাম ফুটবলে লাথি মারে। শহীদ মাঝে মাঝে কাঁদে কবে তার নতুন পা হবে ভেবে। অমলকে খুব তিরস্কার করলাম বেচারাকে মিথ্যে আশা দেবার জন্য। অমল দিব্বি দিয়ে বলল সে তাকে কোনভাবেই এই আশা দেয়নি। এসব নিয়ে কোনও কথোপকথনই হয়নি ওর সঙ্গে। আমি শহীদকে বুঝিয়ে বললাম যে কৃত্রিম পায়ের অনেক দাম। তার জন্য ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ ইত্যাদি লাগে; তার অনেক খরচ। বললাম, "তোকে আমি ক্রাচ কিনে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে হাঁটাচলা অভ্যেস কর।"

শহীদের চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। সে ঘাড় বেঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের নৈরাশ্য মেনে নিয়েছে।

দু'বছর অমলের কোনো খবর নেই। সেবার পুজোর ছুটিতে দাদার কাছে এসে এক মর্মান্তিক খবর পেলাম। বছর খানেক আগে অমল এসেছিল দাদার কাছে তার প্রাণাধিক প্রিয় হারমোনিয়ামটা আর পরীক্ষায় কৃতিত্বের গোল্ড মেডেল দু'হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখতে। টাকাটা দাদা অমলকে ধার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অমল নাছোড়বান্দা। সে নাকি UNO-তে একটা চাকরি পেয়েছে – ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করতে ট্যানজেনিয়ার এক উপজাতিদের গ্রামে যেতে হবে। সঙ্গে হারমোনিয়াম নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া হারমোনিয়াম না বাজালে সুর ভেঙে যাবে। আমাদের মা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন তাই এই হারমোনিয়ামটা তাঁর কাছে থাকলে ব্যবহার হবে। গোল্ড মেডেলটারও আর কোনও দরকার নেই তার। ভেবেছিল মেডেলটার সোনা দিয়ে তার মায়ের হাতের নোয়াটা মুড়ে দেবে; কিন্তু ওর মা ওই লোহার নোয়া নিয়েই চিতায়

উঠেছেন। তিন মাসের মধ্যে বাবাও মারা যান। এখন আর কোনও পিছুটান নেই তার।

দাদার কাছে এই গল্প শুনে আমার চোখের জল সামলাতে পারিনি।

সেদিন রাতে দাদার সাথে চিলেকোঠায় শুতে গেছি। বৌদি অভিমান করে বলে যে দাদা সারারাত হ্যারিকেন জ্বেলে 'অথর্ব বেদ' পড়ে। তাতে নাকি প্রচুর অমোঘ ওষুধের নিগূঢ় রহস্য আছে। বৌদি বুঝতে পারে না – যে মানুষটার সার্জারিতে দু'দুটো ডিগ্রি আছে, আর যে সম্প্রতি আমেরিকা থেকে FACS উপাধি পেয়েছে সে অথর্ব বেদ নিয়ে কেন এত ঘাঁটাঘাঁটি করে! আমরা দুই ভাই নানান গল্প করে রাত ভোর করে দিলাম। মধ্যে মধ্যে আমি দাদাকে বকাবকি করেছি, "শুয়ে পড়। কাল তোর অনেকগুলো অপারেশন আছে।" কে শোনে কার কথা!

শহীদের কথা মনে করে কৃত্রিম পা সম্বন্ধে কথা পাড়লাম।

- "তুই 'জয়পুর ফুট'-এর কথা শুনেছিস কি? ১৯৬৮ সালে জয়পুর নিবাসী রামচন্দর শর্মা rubber based prosthetic leg আবিষ্কার করেন। নাম দেন 'Jaipur Foot'। এখন এই আবিষ্কার সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ পোলিও আর ল্যান্ডমাইনে amputee পায়ের restoration-এর জন্য। দাম মাত্র দু'হাজার টাকা। খুব গরিব হলে এদেশে NGO ফ্রি দেয়।

সেবার ফিরে যাবার আগে ভাবলাম একবার শহীদকে দেখে যাই। গিয়ে দেখি অমলের ঝুপড়ি ঝড়ে ধূলিসাৎ। পুকুরের সবটাই প্রায় কচুরিপানায় ঢাকা। শহীদের খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সে দূরে কোনও এক মহাজনের ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া হিসেবে কাজ করে। গ্রামের মুখিয়াজিকে দাদার নাম ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ জানিয়ে এলাম তিনি যেন শহীদকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে পাঠান।

দু'বছর বাড়ি যাওয়া হয়নি। পিএইচডির ঘানি টানছিলাম। থিসিস জমা দিয়ে দাদার কাছে এসেছি। এখন পাটনা থেকে দ্বারভাঙ্গার যাত্রা খুবই সুগম। গান্ধীসেতু খুলে গেছে। সেদিন রবিবার। বাড়িতে ঢুকে দেখি দাদা সারা গায়ে চটচটে রেড়ির তেল মেখে আশ্বিনের সোনালী রোদে বসে 'Indian Nation' খবরের কাগজ পড়ছে। চারদিকে রেড়ির তেলের বোঁটকা গন্ধ। বললাম, "এ তেল তো রাজপুতরা কাঁচা চামড়ার নাগরা জুতোয় লাগায়। তুই এ তেল গায়ে মেখেছিস কেন?"

দাদা উত্তরে বলল যে অথর্ব বেদে বলেছে রেড়ির তেল মেখে রোদে বসলে নাকি সবচেয়ে বেশি ভিটামিন 'ডি' তৈরী হয়।

চা জলখাবার পাঠিয়েছে বৌদি। ট্রে থেকে চা উঠিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে দেখি শহীদ সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে একটা হাফপ্যান্ট। ডান পা-টা যেন একটু ফ্যাকাশে! দাদা বলল, "চিনতে পারছিস ছেলেটাকে? তোর নাম করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছিল আমার কাছে। খুব কাজের ছেলে। আমাকে অপারেশনে সাহায্য করে। সব সময় তোর আর অমলের জন্য আল্লার কাছে দুয়া ভিক্ষে করে। ওর ডান পা এখন 'জয়পুর ফুট' – দেখে মনে হচ্ছে নকল?"

কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন সকালবেলা দাদা আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল।

- "কী রে, মুখটা এত গুরুগম্ভীর কেন? কোনও খারাপ খবর আছে নাকি?" তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলাম।

- "হ্যাঁ, অমলের সম্বন্ধে একটা খারাপ খবর আছে। ট্যানজেনিয়ার নরখাদক ভুডু (Voodoo) ওঝারা অমলকে খুন করেছে। শুধু ওর মুন্ডুটা একটা বাঁশের ফলকে গেঁথে গ্রামের সীমানার বাইরে রেখে এসেছে। ওরা শত্রুর মুন্ডু খায় না। ওদের ধারণা মানুষের মাথার মধ্যেই ভূত-প্রেত, অনিষ্ট আত্মা সব বসবাস করে।"

ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অমলের জীবনস্মৃতি চারণ করলাম। অতীতের কথা চোখের জলে জমা ছিল। দাদাকে অমলের হারমোনিয়াম আর মেডেলের কথা জিজ্ঞেস করলাম। দাদা উত্তর দিল, "মেডেলটা শহীদের গলায় ঝুলিয়ে দেব। আর অমল বলে গেছে হারমোনিয়ামটা রোজ বাজাতে। না বাজালে সুর পড়ে যাবে।"

ঠিক সেই সময় মায়ের ঘর থেকে হারমোনিয়ামের সুরেলা শব্দ ভেসে এল। মা অমলের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে –

"হারা মরু নদী
ক্লান্ত দিনের পাখি
নিভু নিভু দীপ..."

বসন্ত আওলো রে, দে দোল দোল

গৌতম তালুকদার

হেথায় এ কারাগারে দোল কি লাগে? ভাঙ ভাঙ কারা। অতীত তুমি কি মুখ ফিরিয়ে রবে? কথা কি বলবে না?
দূরে, ঐ সুদূর দূরে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির লীলা-প্রাঙ্গণে আর মানুষের আনন্দ আশ্রমে আমার শৈশবের পুণ্য স্নান।
সে দেশে ফাগুন তার মহিমায় যে আগুন লাগাত, প্রকৃতি তা ছড়িয়ে দিত মানুষের প্রাণে-মনে।
বাঁধভাঙা মানুষের প্রাণ নাচে গানে মুখরিত হয়ে গাইত –

"খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল
স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোল।"

কবির নাচ, গান আর কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতির এই লীলাময় রূপকে আশ্রমবাসী জানাত তাদের ভালবাসার কথা।
মরমে-মরমে বাঁধন কুহু কুহু স্বরে গুঞ্জরিত করে তুলত আশ্রমের আকাশ বাতাস।

হেথায় এ কারাগারে আমি থাকি পড়ে স্মৃতি আর বিস্মৃতি নিয়ে। বসন্ত গানের চরণগুলি সুধায় আমারে –
কারে তুই করেছিস দান তোর মনের মানুষেরে।
কী জানি কবে চলার পথে ধূলায় ধূসর সে।
দে দোল দোল, আমার পরাণে তুফান তোল জ্বালায়ে তোর প্রদীপ শিখা আমার প্রাণের মাঝে।

মিঠি একটি শহরের নাম

সুশীল সাহা

‘মিঠি’ একটি শহরের নাম। এতে কী বোঝা গেল? ওই একটিমাত্র বাক্যবন্ধে কিছুই বোঝানো গেল না। ‘মিঠি’ – এই শব্দটার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। আশির দশকের গোড়ার দিকে শঙ্খ ঘোষের উল্টোডাঙ্গার ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসের ফ্ল্যাটে যেদিন প্রথম যাই সেদিন তাঁর ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজায় দেখেছিলাম লেখা মিঠি/টিয়া। পরে জেনেছিলাম ও দুটো ওঁর দুই কন্যার নাম। অনেকবার ভেবেছি, কেন শুধু ওই দুটো নাম! থাকতে পারত আর যাঁরা ওই ফ্ল্যাটে থাকে, তাঁদের নামও। এগুলো শুধুই ভেবেছি, কাউকে কোনওদিন বলিনি। দুই কন্যার বিয়ে হয়ে যাবার পরেও নামদুটো ঠিকই ছিল। একসময় দেখলাম কে বা কার দুষ্টুমিতে ওই ফলক কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। কিছুদিন পরে দেখলাম ওটা আবার ঠিক করা হয়েছে। তবে মিঠি শব্দটার সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হলাম অতি সম্প্রতি। কীভাবে যেন ছোট্ট একটা ভিডিও এল আমার কাছে। জানলাম মিঠি একটা শহরের নাম। তবে শহরটা আর দশটা শহরের থেকে একেবারেই আলাদা।

তবে শুধু একটা শহরের নাম বললে কিছুই বলা হ’ল না কিন্তু! এই শহরটার অবস্থান পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের মরুভূমি অঞ্চলে। ওখানকার ‘থরপার্কার’ জেলার সদর শহর এই মিঠি। হ্যাঁ, সেই পাকিস্তান, যার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি সারা বিশ্বের কাছে প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। আজ সমগ্র পাকিস্তানে যখন মৌলবাদের শিকার হয়ে দলে দলে সংখ্যালঘুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে কিংবা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এবং এইভাবেই সমগ্র পাকিস্তানের হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে যখন এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র আশি লাখে, তখন সেই দেশেরই পূর্বপ্রান্তে, মিঠি নামাঙ্কিত এই ছোট্ট শহরের মানুষজনের ঘুম ভাঙ্গে মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি শুনে। হ্যাঁ, – এই শহরে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। অবিশ্বাস্য হলেও এই তথ্য সত্যি। এই শহরের কথাই এবার – যদিও সবটাই আমি লিখছি নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত নানান তথ্য থেকে। সত্যিই পরমাশ্চর্যের সেইসব তথ্য।

সমগ্র পাকিস্তানে এই একটা শহর যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। এই শহরের মোট জনসংখ্যা তিন লক্ষ, যার কুড়ি শতাংশ মুসলমান, বাকি আশি শতাংশ হিন্দু। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এখানে মুসলমান ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায় মৌলবাদকে প্রতিরোধ করে পরম শান্তিতে বসবাস করে আসছেন। এই শহরে আজ পর্যন্ত কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। মন্দিরে পুজোর সময়ে মসজিদের লাউড স্পিকার বন্ধ রাখা হয়; আবার মসজিদে নামাজের সময়ে ওই শহরের কোনো মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা বাজে না। রমজানের সময় কোনও হিন্দু বাইরে খান না, শিবরাত্রির দিন মাংস বিক্রেতা কোনো মুসলমান দোকান খোলেন না। হোলির দিন দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে উদযাপন করে উৎসব, একে অপরকে রঙ লাগায়। মহরমের মাসকে দুঃখের মাস গণ্য করে হিন্দুরাও। ওই মাসে ওঁরা বিয়ে কিংবা অন্য কোনও আনন্দ অনুষ্ঠান রাখেন না। ঈদের খুশির দিনে মুসলমানেদের সঙ্গে হিন্দুরাও যোগ দেন। ওই মাসে কোনও কোনও হিন্দু রোজা রাখেন। ইফতারে যোগ দেন অনেকে। শুনলে অবাক হতে হয়, ঈদে এই শহরে কেউ গরু কুরবানি দেয় না; এমনকি বকর ঈদে এখানে ছাগল কুরবানি দেওয়া হয়। গোমাংস এখানে নিষিদ্ধ না হলেও গরুকে এখানকার মুসলমানরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হিন্দুদের কেউ মারা গেলে সবার আগে ছুটে আসে মুসলমান ভাইরা। সবরকম শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেন তাঁরা। অপরদিকে কোনও মুসলমান মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে আসেন হিন্দু ভাইরা, আনুষ্ঠানিক সবকিছুতে যোগ দেন। আসলে মিঠির সমস্ত অধিবাসী মিলে গোটা একটা পরিবার। নানা রকম সহায়ে-সম্পদে, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, অগ্রবর্তিতায় যুগ যুগ ধরে এঁরা এইভাবে দিনযাপন করে আসছেন।

থর-পার্কার জেলার হৃদপিণ্ড এই মিঠি শহরটা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে থাকায় অন্য জায়গা থেকে অনেকেই জীবিকার সন্ধানে এখানে আসে। মিঠি কাউকেই ফেরায় না। তবে বহিরাগতদের এখানে নেই রাত্রি যাপনের অধিকার। বাইরের মানুষের সংস্পর্শে এসে মিঠি তার নিজস্বতা হারাতে চায় না। শিক্ষার হারে মিঠি পাকিস্তানের অনেক জেলা সদরের থেকে এগিয়ে। ছোট্ট শহর হলেও এখানে স্কুলের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে মেয়েদের স্কুলই সাতটি। সবচেয়ে নামি স্কুলের নাম ‘অমর যোগেশ কুমার মালানি হাই

স্কুল'। এখানে আছে তিন তিনটে ডিগ্রি কলেজ। আছে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইউনিভার্সিটি।

যেটা শুনতে একটু আশ্চর্য লাগবে, তা হ'ল মিঠিতে অপরাধের হার খুব কম। পাকিস্তানের যে কোনও জায়গার চেয়ে অনেক কম। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, মিঠি হ'ল পাকিস্তানের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ জায়গা। মৌলবাদীরা নানাসময়ে নানা জাল বিছিয়েছে এখানে। সেগুলো সবই ব্যর্থ করেছে এখানকার মানুষেরা যৌথভাবে।

অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের কোল মাইনিং অথরিটি থর-পার্কার জেলার ৯৬০০ স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে কয়লা খনির আবিষ্কার করেছে, যার মধ্যে ৭৫০ বিলিয়ন টন কয়লা আছে বলে অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। চীনের কারিগরি সহায়তা পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে। ওখান থেকে ৩০০০ টেকনিশিয়ান আসবেন এখানে। প্রস্তাবিত কয়লা খনিগুলোর কয়েকটা ব্লকের অবস্থান মিঠি শহর থেকে একটু দূরে। তাই পাকিস্তান সরকার এই শহরের পরিধি বাড়াবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তৈরি হবে প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য পরিকাঠামো। আশা করা যায় অচিরেই উন্নত মিঠি উন্নততর হবে। এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল হবে আগের চেয়ে।

পাকিস্তান সরকার চাইলেই এই শহরে বহিরাগত মুসলমানেদের পুনর্বাসন দিয়ে এখানকার হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দিতে পারতেন, ঠিক যেভাবে বাংলাদেশের জিয়াউর রহমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মুসলমান অধিবাসীদের পুনর্বাসন দিয়ে পাহাড়ি জনগণকে সংখ্যালঘু করে দিয়েছিলেন। তবে এই একটা জায়গাকে এমনভাবে রেখে দেওয়ার মধ্যেও ও দেশের সরকারের কোনও গূঢ় মতলব আছে কিনা জানি না। তবে তা থাকুক বা না থাকুক, এমন সুন্দর একটা জায়গা স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বছর পরেও তার নিজস্ব চরিত্র হারায়নি; এও কম নয়।

দেশ ভ্রমণের নেশা আমার বরাবরের। নিজের সামর্থ্যে নানা সময়ে নানা জায়গায় গেছি। প্রাণভরে ঘুরেছি কত না জায়গায়! মিশেছি কতরকমের মানুষের সঙ্গে! আপন বৃত্ত থেকে যত বেরোতে পেরেছি ততই পেয়েছি আনন্দ। এই আনন্দের সন্ধানেই একটি ভ্রমণ শেষ করে আরেকটি ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছি পুনর্বার। তবে নানা কারণে অনেক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আর সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অতিমারীর এই দুঃসময়কালে তো সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে আমাদের। ডানাভাঙ্গা পাখির মতো অবস্থায় রয়েছি আমরা। তবু তো স্বপ্ন দেখি, নিশ্চয়ই এই দুঃসময়কাল কেটে যাবে। ফিরে আসবে আমাদের আগেকার সেই স্বাভাবিক জীবন।

সেই জীবন ফিরে আসুক বা না আসুক, আমি মনে মনে স্বপ্ন দেখি 'মিঠি'তে যাবার। আর কোথাও যাই বা না যাই, এই একটা জায়গায় গেলে আমার তীর্থ দর্শনের অভিজ্ঞতা হবে। দেবতা নয়, মানুষরতন খুঁজেছি সারাজীবন। মনে হয় ওই মিঠিতে গেলেই খুঁজে পাব আমার মনের মানুষদের।
স্বপ্ন সত্যি হোক বা না হোক, দেখতে তো আপত্তি নেই!

পাহাড়ি গোখরো

অলোক কুমার চক্রবর্তী

কেওঞ্ঝরগড় জেলা সদরে অফিসের কাজে গিয়েছিলাম। রাতে ওদিক থেকে রওনা দিতে পারলেও প্রায় একশো কিমি রাস্তা পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের ভেতরে প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদের ক্যাম্প শিলজোড়া পর্যন্ত পুরোটা আসার মতো বাহন পাব না, সরাসরি গাড়ির তো প্রশ্নই নেই। মাঝরাস্তায় এসেই থেমে যেতে হবে। তখন আমাদের ক্যাম্পেও কাজের বিস্তৃতির তুলনায় গাড়ি কম ছিল। কাজেই গাড়ি নিয়ে দূরের শহরে গিয়ে এক-দেড়দিন আটকে রাখাও যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না। হোটেলে দ্বিতীয় রাতটাও কাটিয়ে সকাল সকাল রওনা দিয়েছি। রাধেশ্যাম ট্রান্সপোর্টের জাজপুর-চাইবাসা বাস ধরে এসে নেমেছি রিমুলি ছকঅ বা রিমুলি মোড়ে। সেখান থেকে একটি ট্রাক ধরে কালাপাহাড় মাইনিং অফিস। রাস্তার ডানদিকের পাহাড়ের গায়ে ক্যালেণ্ডারের ছবির মতো আটকা ওড়িশা সরকারের মাইনিং অফিস। সোজা রাস্তাটা বারো কিমি দূরের বড়বিলকে ডানদিকে রেখে চলে গেছে কয়রা, টেনসা, রাউরকেলা হয়ে সম্বলপুর। আমাকে যেতে হবে এখান থেকে বাঁদিকের জঙ্গলপথে জোডা হয়ে শিলজোড়া – ২৮ কিলোমিটার পথ। বড়বিল থেকে আসা একটা জিপ পেয়ে গেলাম। তাতেই লিফট নিয়ে জোডা পেরিয়ে ছ'কিমি দূরে একেবারে 'বাঁশপানি রেলওয়ে সাইডিং' অবধি চলে এলাম। এখানে আমার প্রজেক্টের জিপ আসতে বলা আছে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। এখন পৌনে এগারোটা বাজে।

শাল-মহুয়া-পিয়াশাল-কুসুম-হরিতকী-অর্জুনের গাঢ় জঙ্গলভরা পাহাড় জুড়ে আছে লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ আকরের অজস্র ওপেন কাস্ট বা খোলামুখ খাদান। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগুনতি ট্রাক-ডাম্পার আয়রন আর ম্যাঙ্গানিজ ওর নিয়ে এসে ফেলে যাচ্ছে বিশাল লম্বাটে এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে থাকা 'বাঁশপানি রেলওয়ে সাইডিং' জুড়ে। আদিবাসী কুলি-রেজা (মহিলা শ্রমিক)-দের হাতে হাতে, মাথায় মাথায় বাহিত হয়ে তা নিরন্তর ঝড়াং ঝড়াং শব্দে মালগাড়ির লোহার ওয়াগনে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে; চলে যাচ্ছে দূর দূরান্তের কলকারখানায়, বন্দরে। বিকট গর্জনে বুলডোজারগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া আকরগুলিকে ঠেলে এনে একেক জায়গায় ডাঁই করছে। দৈত্যের মতো দুটি শভেলও কাজ করছে। আর বিপুল কর্মকাণ্ডের জেরে চারিদিক আকরিক লোহা আর ল্যাটেরাইটের গুঁড়ো ধুলোয় লালে লাল। গাছপালা, ঘরদোর, গাড়ি, রেজা-কুলিরা তো বটেই, এখানে চলাফেরা করা অন্য কাজকর্মের মানুষদেরও চুল, মুখ, চোখের পাতা, পোশাক – সবেতেই লালের আস্তরণ। কিছুটা ম্যাঙ্গানিজের কালচে নীলও তাতে মিশে আছে।

জোডা-বামেবাড়ি এক্সপ্রেসওয়ে একধার দিয়ে চলে গেছে সোজা। তার দু'পাশেই বড় বড় মহুয়া আর কুসুম গাছের সারি। ডানদিকে কয়েকটি টায়ার সারাই, গাড়ি সারাই ইত্যাদির দোকান, পান-বিড়ি-চা-জলখাবার, দেশি মদের বেআইনি দোকান – এসবও আছে। আর আছে অতি আবশ্যিক হাঁড়িয়ার ঠেক। রাস্তা থেকে বাঁদিকে সামান্য ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাইডিংয়ের এলাকা। প্রথমেই কিছুটা ফাঁক দিয়ে দিয়ে নানা মাইনিং কম্পানির সাইডিং অফিস। এদের মধ্যে দোকান জাতীয় একটিই আছে – রুংটা কম্পানির অফিসের গা ঘেঁষে গদাধর সাহুর "সাহু হোটেল অ্যাণ্ড টি স্টল"। গালভরা নাম হলেও আসলে শালের খুঁটির ওপর পাতা ত্রিপল, তেলের ও পিচের ড্রাম কেটে তৈরি করা শিট – এসবের নীচু ছাউনি অনেকটা জুড়ে। দুটো পাশ ত্রিপল আর ড্রামের শিট দিয়ে ঘেরা, বাকিটা খোলা। রাতে কাঠের বাটাম দিয়ে তৈরি ফ্রেমের গেট-মতো আগল দিয়ে দু'দিকের খোলা জায়গা আটকানো হয় কুকুর, জন্তু-জানোয়ার আর পাগল-মাতাল-ভবঘুরেদের ঢুকে পড়া থেকে বাঁচাতে। এদিকেও একটু দূরে দু'তিনজন বসে হাঁড়িয়া নিয়ে। এটা এখানে কাজ করা রেজা-কুলিদের তো বটেই, অন্য অনেক অভ্যস্ত জনেরও আবশ্যিক "এনার্জি ড্রিংক"। কাজের মধ্যে একটু অবসর বার করতে পারলে, ঠিকাদারের মুন্সিকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসে দু'ঢোঁক মেরে দিয়ে যায়। আবার রেজাদের পিঠে বাঁধা বাচ্চাটা বিরক্ত করলে তাকেও এক-আধ ঢোঁক খাইয়ে দিলে সে নেশার ঝোঁকে ঝিমোতে থাকে। ওর পেটটাও ভরে থাকে। ভাত থেকেই তৈরি তো!

সাইডিংয়ের ওপর হওয়ায় সাহুর হোটেলে ভিড়টা একটু বেশিই হয়। সকালের নাস্তা তো বটেই, দুপুরের আর রাতের খাবারটা পাওয়া যায় বলে ওর এখানে মাসকাবারি বাবু-খদ্দের অনেক।

রাতের খাবার সবাই টিফিন ক্যারিয়ারে করে সন্ধ্যের মধ্যেই নিয়ে চলে যায়, অথবা গদাধর টিবরু পিঙ্গুয়া আর বীরা লাগুরিকে দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেয়। এমনিতেও সন্ধ্যের পর বেশিরভাগ বাবুদের মহুয়া বা দেশি মদের কল্যাণে আর চলাফেরার বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। হোটেলের পরিবেশন সমস্ত কাঁচা শালপাতার থালা আর ডোনাতেই হয়। নইলে অত বাসন ধোয়ার জল কোথায়? রান্নার ও খাওয়ার জল পাম্প হাউসের কল থেকে ভারী বয়ে এনে দিয়ে যায়। অন্য কাজের ফাঁকে কিছুটা এনে দেয় জেমা হোরো নামের মেয়েটাও। আর বাসন ধোয়া ও অন্য ধোয়াধুয়ির জল ওই ভারীরাই কাছের খোলা ইঁদারা থেকে এনে দেয়। এখানকার মাটি যেমন লোহা-ম্যাঙ্গানিজের খনি, জল তেমনি ম্যালেরিয়ার খনি। দোসর হিসেবে টাইফয়েডও আছে। তাই খাবার জলটা খুব সাবধানে আনিয়ে, কর্পূর, জিওলিন ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। বাসন ধোয়ার ব্যাপারে রুংটা কম্পানির ডাক্তারসাহেব গদাধরকে ভাল পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ইঁদারার বা অন্য জলে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তো থাকবেই। ওই জলে বাসন ধুলে তাইতেও ওই জীবাণু লেগে থেকে লোককে অসুখে ফেলবে। আর অসুখে পড়ে লোকে খেতে না এলে গদাধরের "লস", ওর হোটেলের বদনামও। এই বুঝিয়ে ডাক্তারসাহেব ওকে বলেছিলেন – একটা বড় গামলা বা অর্ধেক কাটা ড্রামে যেন জল সর্বদা ফুটন্ত থাকে। সাধারণ জলে বাসন, চা ও জল খাওয়ার গ্লাস, চামচ ইত্যাদি একবার ধোয়ার পর যেন ওই ফুটন্ত গরম জলে ফেলা হয়। ওতে সব জীবাণু মরে যাবে। তারপর সেটা ব্যবহার করলে আর বিপদ হবে না। জঙ্গলে লকড়ির তো অভাব নেই! কাঠের আগুনেই সব রান্নার কাজ হয়! কাজেই গদাধর বাড়তি প্রায় কোনো খরচ না করেই ফোটানো জলের ব্যবস্থাটা চালু করে দিয়েছে। লোকের চোখে একটু জাতেও উঠেছে বলা যায়। ঘরেও এখানে একটু সচেতন মানুষেরা সবাই ফোটানো জলই খায়।

আমি সময় কাটাতে গদাধর সাহুর হোটেলে আমার এবং এখানকার অনেকেরই প্রিয় আইটেম 'সেউ-বুন্দি মিক্স' কাঁচা শালপাতার ডোনায় নিয়ে টুকটাক খেয়ে যাচ্ছি, আর সাইডিংয়ের কাজ, ট্রাক-ডাম্পারের আনাগোনা দেখে যাচ্ছি। একটা ব্যাপার বেশ অনুভব করি, এখানকার খাবারদাবারে, মানুষের গায়ে, পোশাকে, এমনকি হাওয়াতেও কেমন একটা আলগা বুনো গন্ধ – বনতুলসী, পুটুসঝাড়, মহুয়া-কুসুম-কেন্দ ফল, কুরচি, চিহড় – সবের একটা মিলিত গন্ধ পাওয়া যায়। খুব গোড়ার দিকে একটু অন্যরকম লাগত। কিন্তু এখন যেন ওই বুনো গন্ধটা না পেলেই কেমন ফাঁকা বা অস্বস্তি লাগে। এই যে এখন কাঁচা শালপাতার ডোনায় সেউ-বোঁদে খাচ্ছি তারিয়ে তারিয়ে, এতেও ওই শালপাতার গন্ধটা অনুষঙ্গ হয়ে আছে। না, শহুরে পালিশ বা প্রসেস করা শালপাতায় সেই গন্ধ পাওয়া যাবে না।

গদাধর সাহু এখন ভিড়ের দাপট না থাকায় ধারের খদ্দেরদের হিসাবগুলো খাতায় চড়াচ্ছে নিজের স্মৃতি থেকে নিয়ে। কাজের লোকেদের একজন কড়াইয়ে আলু-নেনুয়ার তরকারি রান্নায় ব্যস্ত। অন্যরা একজন লকড়িগুলো গোছাচ্ছে, আরেকজন চাল ধুচ্ছে।

হঠাৎ গদাধরের দ্বিধাগ্রস্ত গলা শোনা গেল,

- "আরে, কনেইয়া রে! আজি দত্ত কম্পানিরঅ মুখার্জিসাব আসিথিলে কি রে? নাস্তা করিকিরি গলে?"

মাসকাবারি গ্রাহকদের খাতায় হিসেবগুলো চড়াতে চড়াতে স্যাম্পলিং ও অ্যানালিসিস কম্পানি 'দত্ত ডি.কে. ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর 'বাঁশপানি সাইডিং ম্যানেজার' টি.কে. মুখার্জির পাতাটায় এসে গদাধর থমকে গেল।

চাল ধুতে ধুতে বছর সতেরো-আঠারোর আদিবাসী ছেলে কনেইয়া জবাব দিল, "মু দেখি নাই পরা!"

গদাধর খিঁচিয়ে উঠল, "কী করিস কী তোরা? রোজকার লোকগুলো কে এল না এল, তাদের মুখগুলো মনে রাখবি না? তোরাই তো দিস সবাইকে!"

- "আমার মনে পড়ছে না" – নির্লিপ্ত জবাব কনেইয়ার।

একটা জিনিস খেয়াল করেছি, এই প্রান্তিক মানুষগুলো যখন নিজেদের মতো জঙ্গলে ঘোরে, পাখি-খরগোশ-ইঁদুর মারে তির, গুলতি বা পাথরের অব্যর্থ নিশানায়, বা মহুল কুড়োয় গাছতলা থেকে, তখন এরা বেশ প্রাণবন্ত থাকে। এদের চোখমুখ চকমক করে। কিন্তু এই শহুরে মানুষদের মতো চাকরি বা বাঁধাধরা কাজ করার সময় এরা নির্লিপ্ত নির্জীবের মতো যান্ত্রিকভাবে যেন কাজগুলো করে যায়।

গদাধর চিন্তান্বিত মুখে শুধোয়, "আচ্ছা, মুখার্জিসাহেব আজ আসবেন না, বা বাইরে যাবেন, এরকম কিছু বলেছিলেন কি

কাল?”

- “জানি না তো!”

- “সেই তো! বাইরে গেলে তো বলে যেতেন! আচ্ছা, কাল রাতের খাবার পাঠিয়েছিলি?”

- “সে তো বীরা ‘টিপিংকারি (টিফিন ক্যারিয়ার)’ দিয়ে এসেছে। জেমা দুপুরে ফেরৎ আনবে।”

- “হুঁ, তেবে ত নিশ্চয়অ আসিথিলে”; এবার প্রত্যয়ী হয় গদাধর, “তোরা কী রে? মানুষটা রোজ এসে এত হৈহল্লা, মজা করে যায়, আর তোরা মনেই রাখলি না!” গদাধর গজগজ করতে করতে এবার হিসেব ঠিক করায় মন দেয়।

- “আচ্ছা, মুখার্জিসাহেব সকালে এলে কী কী নেন বল তো?”

এবার দেখা গেল কনেইয়ার সঙ্গে জিতু কারিয়া নামের ছেলেটাও যোগ দিয়ে যৌথভাবে ফিরিস্তি দিতে লাগল। অর্থাৎ, ওঁর রুটিন মোটামুটি এদের মুখস্থ।

- “উনি এসে প্রথমেই দুটো বিস্কুট খেয়ে জল খান। আর ছ’টা বিস্কুট নিয়ে কুকুরগুলোকে খাওয়ান – এটা ওঁর বাঁধা কাজ।”

- “হুঁ, তারপর?”

- “তারপর একটা চা আর একটা ‘গোল্ড ফিলেক’ নেবেন। আর রোজই তো সঙ্গে কেউ থাকলে তাদের তিন-চারটে চায়ের দাম উনিই দিয়ে দেন। কাউকে দিতে দেন না।”

- “সে ঠিক আছে। আজ খেয়াল করিসনি যখন, অতগুলো না ধরে দুটো বাড়তি চা ধর। না হয় আমার একটু লস হ’ল আজ। তাহলে হ’ল – আটটা বিস্কুট, তিনটে চা, একটা গোল্ড ফিলেক; তারপর বল...”

হিসেব এগিয়ে চলে।

- “নাস্তা করতে বসে উনি তো প্রথমে এক পিলেট (প্লেট) মানে চারটে পুরি-সব্জি নেন, পরে আবার হাফ পিলেট গরম পুরি-সব্জি। তারপর হাফ পিলেট সেউ-বুন্দি। এভাবে তাঁর রোজকার নাস্তা চলে।”

- “বেশ, তাহলে দেড় প্লেট পুরি-সব্জি, হাফ প্লেট সেউ-বুন্দি, এই তো?”

- “না, তারপর আবার একটা চা, একটা সিগারেট ধরিয়ে এক প্যাকেট গোল্ড ফিলেক নিয়ে যান। আর এদিকে থাকলে এইরকম সময়ে আরেকবার চা খেতে আসেন। তবে আজ তো এখনও আসেননি।”

- “ঠিক আছে, সেটা পরে দেখা যাবে। তাহলে দাঁড়াল, আরো একটা চা, একটা লুজ গোল্ড ফ্লেক আর প্যাকেট একটা। মাচিস নেয় না?”

- “না, ওঁর তো সেই বাজনাওয়ালা লাইটার আছে!”

যাক, মাচিসের পয়সাটা অন্তত মুখার্জিসাহেবের ঘাড়ে চাপল না! আমি নীরব শ্রোতা-দর্শক, সবটাই শুনে বা দেখে যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল এতক্ষণ চুপচাপ বড় বড় বাসনগুলো মাজতে থাকা “জেমা” নামের কালো পাথর কুঁদে তৈরি করা চেহারার যুবতী মেয়েটি। ও এখানে জল বয়ে এনে দেয়, অন্য কাজও করে। জেমা কাজ করতে করতে চুপ করে সব শুনে যাচ্ছিল খালি। আর থাকতে না পেরে বেশ জোরেই বলে উঠল,

- “আরু কেত্তে দু’নম্বরি করিবু রে তু, সাহু? মানুষটা এসেছে কিনা, খেয়েছে কিনা কিচ্ছু জানিস না, কেউ দেখিসনি। আর দিব্যি তার নামে খাতায় চড়িয়ে দিলি! ফোকটের জায়গায় হোটেল বানিয়ে করে খাচ্ছিস, তারপরেও ভাল মানুষগুলোর সঙ্গে দু’নম্বরি করছিস? তুই তো পচে মরবি রে সাহু?”

গদাধর সাহুর আঁতে ঘা লেগে যায়, পাল্টা বলে ওঠে, “অ্যাই, তুই আমার এই হোটেলের পয়সায় খাচ্ছিস, আবার আমাকেই উল্টোপাল্টা কথা বলছিস? বেশি বেড়ে গেছিস!”

ফোঁস করে ওঠে জেমা, “এই সাহুর পুঅ, তু এমিতি এমিতি পোইসা দেউ নু মোতে। মু কামঅ করুছি, সেয়া পোইসা দেউছু তু। তুই দান করছিস না আমায়। হুঃ, দু’নম্বরি করে সবাইকে ঠকিয়ে সাইডিংয়ের জায়গায় হোটেল করতে পেরেছিস। আর কেউ জায়গা পেয়েছে? আমি জানি না কিছু?”

- “বেশি বড় বড় কথা বলবি না। আমি রীতিমতো কালেক্টরের পারমিশন নিয়ে এই হোটেল বানিয়েছি!”

- “ইঃ! রখি দে তোরঅ কলেক্টর-পারমিসন। তু যে যেবে মন হেউচি মোর দুধগা চিপি দেউচু, লুগা (কাপড়) ভিতরে হাতঅ পসাই (ঢুকিয়ে) দেউচু, পছে হাতঅ মারি দেউচু – এ সব্বু ভি তোকু কলেক্টর পারমিসন দেই দেইছন, না কঁড় রে সাহুর পুঅ?”

হঠাৎ এই আক্রমণ বোধহয় গদাধর সাহু একেবারেই ভাবেনি। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। বিশেষত আমি রয়েছি, আরো তিন-চারজন ড্রাইভার জাতীয় লোক চা খেতে সদ্য ঢুকেছে দোকানে। ওরা তো হো হো করে হেসে উঠেছে। এভাবে হাটে

হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ায় সাহুর মুখ একেবারে চূণ। কোনোমতে তোৎলাতে তোৎলাতে বলে উঠল, "যা-যা, থাক। তা তু-তু-তুই তো আগেই ব-বলতে পারতিস যে মুখার্জিসাহেব আজ আসেননি। তুই তো ওঁর ঘরের সব কাজ করে দিস। তুই বললেই পারতিস। ঠিক আছে, এই দেখ, কেটে দিলাম মুখার্জিসাহেবের হিসাব।"

কিন্তু রাগ কমেনি জেমার। গজগজ করতে থাকে, "আমি ধরলাম বলে কেটে দিলি। রোজ আরো কতজনের এইরকম চড়াস কে জানে?"

সাহুর ব্যবসার গুডউইল নিয়ে টানাটানি। সামাল দিতে দাবড়ে ওঠে, "অ্যাই জেমা, বাজে কথা বলবি না একদম। বেশি বেড়ে গেছিস! আমারই পয়সা নিচ্ছিস, আবার আমার ওপরেই বলে যাচ্ছিস!"

ব্যস! দপ করে জ্বলে উঠল কালো পাথরে কোঁদা চেহারার মেয়েটা একেবারে ফণা তোলা সাপিনীর মতো, "আইঁ কাম পাইতিয়া" হো ভাষায় ঘোষণা করে দিল। "করব না তোর কাজ; যাকে দিয়ে পারিস, করিয়ে নিস। যাকে খুশি পয়সা দিস, গায়ে হাত বোলাস!" আধা মাজা বাসনপত্র ফেলে রেখে সোজা হাঁটা দিল পাশের হাইওয়েতে উঠে, নিজেদের হো ভাষায় গজগজ করতে করতে।

গদাধর কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইল। কথার ঝোঁকে আর কিছুটা খদ্দেরদের সামনে নিজের মান বাঁচাতে কথাগুলো বলে ফেলেছে। কিন্তু তার পরিণতি এরকম হবে ভাবতে পারেনি একেবারেই। এখানে সবাই লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজেই যুক্ত বা খাদানের কাজে। নিজেদের মতো দলবেঁধে কাজ করে। ট্রাকে কাজ করলে খাদানে খাদানে ঘোরাও হয়, বৈচিত্র্য থাকে। যাতায়াতের পথটুকু ডালায় বসে নিজেদের মাটির ভাষায় সুর তুলে গান গাইতে গাইতে সময় কাটায়। হপ্তা শেষে মুন্সির কাছ থেকে ট্রিপ হিসেবে বা ঝুড়ি হিসেবে পয়সা নেওয়া, টিপসই দিয়ে। অনেক স্বাধীন; তবু হ্যাঁ, কন্ট্রাক্টর বা মুন্সি জাতীয় দিকু বা ট্রাক ড্রাইভারের একটু ছোঁকছোঁকানি, গায়ে, পাছায় হাত বোলানো এগুলো মেনে নিতেই হয়। সে সর্বত্রই আছে এখানে। এটা ওরা জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখে আসে, তাই সংস্কারের মধ্যেই মিশে গেছে অপরিহার্য ভেবে নিয়ে। সপ্তাহের ছুটির দিনগুলো ওদের একেবারে নিজস্ব থাকে। সাজগোজ করবে, দূরের হাটে যাবে, অফুরন্ত আনন্দ করবে, নেশা করবে। ওই দিনের পয়সা পায় না ওরা, কিন্তু স্বাধীনতাটা পায় বলে তার পরোয়াও করে না। আর এজন্যই এখানে হোটেলে বা ঘরোয়া কাজের জন্য কাউকে পাওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার। এদিকে জেমা তো জল বয়ে আনা থেকে আরম্ভ করে অনেক কাজই করে দেয়। ও একটু অন্য ধাঁচে গড়া। আরো একটা বিশেষ কারণে জেমা সাইডিংয়ের বা ট্রাক-লোডিংয়ের কাজে ভেড়েনি।

সম্বিত ফিরে পেয়েই গদাধর ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে, "আরে, এই জেমা, রাগ করিস না। শোন, ফিরে আয়। এভাবে ডোবাস না।"

- "কাঁইয়া" – সপাট জেদি জবাব আসে হো ভাষায়, "আমি তোর কাজ করব না।"

গদাধরের উঠে রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে করুণ কাকুতি মিনতিতেও চিঁড়ে ভেজে না। একটাই জবাব, "কাঁইয়া।"

হতাশ হয়ে ফিরে এসে গদাধর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ে।

- "ইয়ে হেলা পাহাড়ি নাগিনটা পরা! থরে 'কাঁইয়া' কহি দেলা কি সব্বু বন্ধ। সিয়ে 'কাঁইয়া' আউ 'এয়া' হেব নি।" তারপরেই দাবড়ে ওঠে কনেইয়া, জিতু আর বীরার ওপর, "আর তোরাও এমন! কাকে কাকে দিচ্ছিস খেয়াল রাখবি না? আমি সবটা খেয়াল রাখতে পারি না বলে তোদের জিজ্ঞাসা করি। তোরা তো বলবি যে মুখার্জিসাহেব আজ আসেননি।"

যাদের বলা হ'ল, তাদের কোনো হেলদোলই নেই। চুপচাপ নিজেদের কাজ একটার পর একটা করে যেতে লাগল নির্বিকার চিত্তে। কনেইয়া চাল ধোয়া শেষ করে অন্য উনুনে ফুটন্ত জলের হাঁড়িতে চাল ছেড়ে দিল।

হতাশ সাহু বলে, "হ্যাঁরে, জেমাটা না থাকলে তো মুশকিল! দেখি, ওই মুখার্জিসাহেবকেই ধরতে হবে।"

আমি একটু যেচেই জিজ্ঞেস করি, "তুমি ওকে এতটা রাগিয়ে দিলে কেন? জানোই তো এই আদিবাসীরা কতটা সরল আর এককথার মানুষ হয়! ও এখন গেল কোথায়?"

সাহু জবাব দেয়, "ও এখন মুখার্জিসাহেবের ঘরেই গেছে তাঁর ঘরদোর, বাসন পরিষ্কার করতে। অন্যদিন এখানকার কাজ সেরে যায়। আজ আগেই চলে গেল। আসলে ওই সাহেব তো ওর

কাছে দেবতা।”

- “কেন? দেবতা কেন?”

- “জানেন না? জেমার বাবা স্যামুয়েল হোরোকে ওই হাইওয়েতে এক ডাম্পার ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। কোমর আর ডান পা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এই মুখার্জিসাহেবই দেখতে পেয়ে ওঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে প্রথমে বড়বিল হাসপাতাল, সেখানে ভাল হবে না বুঝে কাদের ধরাধরি করে নোয়ামুণ্ডির টিসকো হাসপাতাল, সেখান থেকে টাটা – অনেক দৌড়ঝাঁপ করে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। অমানুষিক কাজ করেছেন উনি! স্যামুয়েল প্রাণে বেঁচে গেলেও ওর আর কাজ করার ক্ষমতা নেই। এই জেমা তখন ছোট ছিল। কীসব লেখালিখি করে মুখার্জিসাহেব ওকে ইন্সিওরেন্সের টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। ডাম্পার মালিকের থেকেও টাকা আদায় করে দিয়েছেন। ওই মানুষটা এইরকম আরো অনেকের জন্যই করেছেন। সেই থেকেই জেমার কাছে উনি ভগবান। ওর বাবার আর মুখার্জিসাহেবের দেখাশোনা করার জন্যই ও খাদানের বা সাইডিংয়ের কাজ নেয়নি। আমারই ভুল হয়েছে, জেমাকে শুধিয়ে নিলেই হতো। তখন মাথায়ই আসেনি যে ও চুপচাপ এখানে কাজ করে যাচ্ছে” – সাহু আফশোসে বিড়বিড় করতে থাকে।

এই টি.কে. বা তরুণ কান্তি মুখার্জির সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে। শ্যামবর্ণ, মাঝারি উচ্চতা ও পাতলা চেহারার মানুষটি প্রচণ্ড আমুদে, সুরসিক ও মিশুকে। আর মুখের কোনো আগল নেই। আদিরসাত্মক জোকের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পানাসক্তি আছে বেশ, তবে মাতলামোর কেচ্ছা নেই তেমন। মদ এবং খাবার দুইই খেতে আর খাওয়াতে ভালবাসেন খুব। কিন্তু এই খনি এলাকায় নারী-শরীর বেশ সহজলভ্য এবং ওঁর একা থাকা সত্ত্বেও সে সংক্রান্ত কোনো বদনাম টি. কে. মুখার্জির নামে ছড়ায়নি। এই এক্সপ্রেসওয়ে ধরে একটু এগিয়ে ডানহাতে একটা রাস্তা ঢুকে গেছে ডি. লাল কম্পানির পরিত্যক্ত ম্যাঙ্গানিজ মাইনসের দিকে। সেই পথে একটু ঢুকে একটা অল্প উঁচু টিলার ওপর সাজানো ওই মাইনসের কলোনির ঘরগুলো। তার কয়েকটিতে ডি. লাল কম্পানির মেন্টেন্যান্স আর সিকিউরিটি স্টাফরা থাকে। তাছাড়া বাকি ঘরগুলো এখানে নানা পেশায় থাকা লোকজন ভাড়ায় নিয়ে বাস করে। টি. কে. মুখার্জিও তেমনই একটি কোয়ার্টার নিয়ে থাকেন। আদতে উনি কলকাতার তালতলা এলাকার মানুষ। বৌ, ছেলে সেখানেই পৈতৃক বাড়িতে থাকে। কিন্তু মুখার্জির কথায়, “জানেন তো মশাই, এই বুনো গন্ধ, লাল ধুলো আর সাদা মনের মানুষগুলোর যে টান, নেশা – এ এড়ানো যায় না। জন্ম থেকে টালা ট্যাঙ্কের জল খেয়ে এসেও এখন আমার এই পাহাড়ি, তিতকুটে জল ছাড়া খাবার হজম হয় না।”

মুখার্জির কলকাতায় আরো অসুবিধে আছে। যেমন, “আরে মশাই, এক তো বাড়ি গেলে মদের রেস্ট্রিকশন। আর এদিক-সেদিক করে একটু ম্যানেজ করতে পারলেও, এই যে খাঁটি মহুয়ার মতো অমৃত! এ কোথায় পাব ওখানে? তার ওপর কখনো সখনো দু-এক ডোনা হাঁড়িয়া! আর জানেন তো, এখানকার মানুষগুলো বড় নির্ভেজাল।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার অফিসের জিপ নিয়ে চালক সুরেশ কামাথ এলে আমরা আরেক রাউণ্ড চা খেয়েই রওনা দিলাম শিলজোড়া ক্যাম্পের দিকে, এক্সপ্রেসওয়েতে উঠে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে। ডি. লাল কম্পানির মোড়টার কাছে আসতেই দেখি জেমা ওই কলোনির ভেতর দিক থেকে হাঁচোড় পাঁচোড় করে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে “এ সাহাব, রহি যা, রহি যা” বলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে হাত তুলে আমাদের থামার ইশারা করতে করতে। সুরেশকে বলে গাড়ি থামাতেই জেমা কাছে এসে হাঁউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, “মোর সাহাবকু মু মারি দেলি। তু যেমিতি হেউ বঞ্চা তাকু।”

যা উদ্ধার করতে পারলাম, সাহুর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে মুখার্জির ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজা খোলা দেখতে পেয়ে জেমার একটু সন্দেহ হয়। তাই পা টিপে টিপে উঁচু বারান্দায় উঠেই দেখে ঘরের ভেতরের দিকে খাটের কাছে মুখার্জি মাটিতে পড়ে রয়েছেন; আর ঘরের মাঝামাঝি এক পাহাড়ি গোখরো ফণা তুলে ছোবল দিতে উদ্যত। হয়তো সামান্য নড়াচড়া দেখলেই ছোবল মারবে। দরজার গোড়ায় হাওয়ায় দরজা বন্ধ হওয়া ঠেকাতে যে পাথর রাখা থাকে, সেই ভারী পাথরটা জেমা মুহূর্তের মধ্যেই তুলে নিয়ে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মেরেছে সাপটার গায়ে। সাপটা শব্দ পেয়ে সেই মুহূর্তেই এদিকে ফিরেছিল। ভারী পাথরটা ওটার গায়ে লেগে সাপটাকে তো ছেতরে দিয়েছেই, কিন্তু ওখান থেকে ছিটকে গিয়ে পাথরটা মাটিতে পড়ে থাকা মুখার্জির

কপালে আঘাত করেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। জেমা দ্রুত পাথরটা নিয়ে আহত সাপটার মাথা পুরো থেঁতলে দিয়ে আগে সাপটার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। তারপর মুখার্জিরই একটা গেঞ্জি নিয়ে কপালের কাটা জায়গাটা বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু মুখার্জির কোনো জ্ঞান নেই। রক্ত বেরিয়েছে অনেক।

এমনিতে সবাই কাজে চলে যাওয়ায় কলোনি ফাঁকা! তবু লোক ডাকতে ঘর থেকে বার হতেই ও টিলার মাথা থেকে দূরে আমাদের জিপটা দেখতে পেয়ে দৌড় দিয়েছে থামানোর জন্য। এই জিপটা ও চেনে। জেমার হাতে আর কাপড়ে দেখি রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। জেমাকে জিপের পেছনে বসিয়ে নিয়ে টিলার ওপর কলোনিতে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠে মুখার্জির ঘরে ঢুকতে গিয়ে প্রথমেই শিউরে উঠলাম ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে থাকা পাহাড়ি গোখরোটাকে দেখে। কী হতে পারত তা অনুমেয়। আর তারপরই দুর্গন্ধের চোটে মালুম হল মুখার্জির বেহুঁশ পড়ে থাকার কারণ। ঘরের মেঝেতে নানা ব্র্যাণ্ডের বেশ কয়েকটি মদের খালি বোতল, কাঁচের গ্লাস গড়াগড়ি খাচ্ছে। বমি হয়ে অজীর্ণ খাবার ছড়িয়ে আছে মেঝেতে, লেগে আছে মুখার্জির মুখে, গায়ে। বুঝলাম কাল রাতে 'পার্টি' হয়েছে। বোধহয় নানা জন নানা ব্র্যাণ্ডের মদ ফ্রিল্যান্সের মতো নিয়ে এসেছে; আর সব মিলেমিশে পেটে গিয়ে তা মোরগের রংবাহারি লেজ দেখিয়ে দিয়েছে। মানে নেশার দুনিয়ায় যাকে 'ককটেল' বলে। রাতের নেশার সঙ্গীরা হয়তো টালমাটাল হয়েই চলে গেছে। মুখার্জির জিপের ড্রাইভার ছুটিতে। উনি নিজেই ড্রাইভ করে ক'দিন ধরে সাইট ভিজিট সারছিলেন। জিপটা গ্যারেজেই পড়ে রয়েছে, আজ নিষ্কর্মা। বুঝলাম এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে। অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। আমার সরকারী চাকরি, সরকারী গাড়ি। আমাদের পক্ষে এইভাবে বাইরের কারো ব্যক্তিগত কোনও ঝামেলায় জড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। গাড়িতেও বাইরের কাউকে নেওয়া যায় না। কারণ, কিছু হয়ে গেলে তার জল যে কতদূর গড়াবে কে জানে? কিন্তু এখানে অন্য উপায় নেই। বাকি সব পরে সামলাব, আগে তো মানুষটার প্রাণ! জেমা ততক্ষণে জল এনে মুখার্জির গা, মুখ পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমি গাড়িতে তোলার কথা বলতেই সুরেশের সামান্য সাহায্য নিয়ে জেমা প্রায় একাই মুখার্জিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এসে জিপের ব্যাকসিটে বসল। মুখার্জির মাথাটাকে পরম মমতায় কোলের ওপর নিয়ে আঁকড়ে ধরল। তার আগে ও এই কলোনির কেয়ারটেকারকে হাঁক দিয়ে বলে দিল, মুখার্জিসাহেবের ঘরটায় যেন তালা দিয়ে চাবি নিজের কাছে রেখে দেয়। জানিয়ে দিল, সাহেবের শরীর খারাপ, হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। জেমা এতক্ষণ ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুধু বলে যাচ্ছিল, "হে প্রভু যীশু, হে মাতা মেরি, তোমরা ভগবান। আমার এই রক্তমাংসের ভগবানকে তোমরা বাঁচিয়ে দাও। হে মারাংবোঙা, তুমি ওকে বাঁচিয়ে দাও।" জিপে বসেও জেমা বিড়বিড় করে সেই কথাই বলতে লাগল।

সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল বড়বিল সরকারী হাসপাতালে যাওয়ারই। কাছে তিন কিমি দূরে টিসকোর "জোড়া ওয়েস্ট মাইনসের" হাসপাতাল আছে। কিন্তু ওটা প্রাইভেট, কম্পানির কর্মচারীদের জন্যই শুধু। প্রভাব খাটিয়ে চিকিৎসা পেতে গেলে যে কাঠখড় পোড়াতে হবে, অত সময় হাতে নেই। আরো পনেরো কিমি গেলে বড়বিল, কিন্তু সরকারী হাসপাতাল বলেই ঝঞ্ঝাট কম। ওখানকার সি.এম.ও. ডাঃ বি.কে. জেনা খুবই পরিচিত, সজ্জন এবং ভাল চিকিৎসক। পদবী ওড়িয়া হলেও উনি নিজেকে মেদিনীপুরের বাঙালি বলে পরিচয় দেন। নিখুঁত বাংলা বলেন। আমাকে নিজের গন্তব্যের উল্টোদিকে আঠারো কিমি যেতে হবে।

যাওয়ার পথে আমি সাহুর হোটেলের কাছে থেমে ওকে সংক্ষেপে সবটা বলে, আমার প্রজেক্ট ম্যানেজারের উদ্দেশে একটা চিরকুট লিখে জানিয়ে দিলাম যে, বিশেষ প্রয়োজনে আমার ফিরতে দেরি হবে। ফিরে সব বলব। আর সাহুকে বললাম, "তোমার পাপ কাটাতে এই চিরকুটটা সাইডিং থেকে শিলজোড়া লোডিং নিতে যাচ্ছে এইরকম কোনো ট্রাকে ধরিয়ে দিয়ে বলো যেন অতি অবশ্যই আমাদের 'শিলজোড়া এম. ই. সি. এল. ক্যাম্প'-এ পৌঁছে দেয়।" সুরেশ এবার গাড়ি ছোটাল তীরবেগে পাহাড়ি রাস্তায়, সেই কালাপাহাড় মাইনিং অফিস ঘুরে বাঁদিকে বড়বিলের পথে।

বড়বিল শহরে ঢুকেই ডানদিকে "দত্ত ডি.কে. কম্পানি"-র জোনাল অফিস। মুখার্জির অফিসে খবর দেওয়া উচিত। তাই ওখানে জানালাম। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দু'তিনজন

বাইক নিয়ে আমাদের পেছন পেছন বড়বিল সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে গেল। ডাঃ জেনা অভিজ্ঞ মানুষ, টি. কে. মুখার্জিকেও খুব ভাল চেনেন। এক লহমায় পরিস্থিতি বুঝে নিয়েই চিকিৎসা চালু করে দিলেন। ব্লাড গ্রুপ ম্যাচ করিয়ে দরকার হলে রক্ত দিতে হবে; তবে তাতে সমস্যা হবে না জানালেন। বিশেষ করে জেমার দেওয়া প্রাথমিক শক্ত বাঁধন আরো বেশি রক্তপাত আটকে দিয়েছে। তাছাড়া মুখার্জির অফিসের সহকর্মীদলও তাদের প্রিয় মানুষের জন্য এসে গেছে। কাজেই তেমন চিন্তার কিছু নেই। আমি জেমার হাতে আপৎকালীন প্রয়োজনের জন্য জোর করে কিছু টাকা দিতে চেয়েও ওকে রাজি করাতে পারলাম না।

ও শুধু ডাক্তারবাবুর উদ্দেশে বলল, "তু মানে যেত্তে যাহা করিবার কর, খালি তাঙ্কু বঁচাই দে। মু এঠারু কঁউঠি ভি যিবিনি।" ও মুখার্জির মাথার দিকে একটু দূরত্ব রেখে মেঝেতেই বসে পড়ল। আমি ডাঃ জেনার দিকে চেয়ে একটু ইশারা করলাম। উনিও ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখি, ঘন্টা দুয়েক আগের দেখা সেই তেজি পাহাড়ি গোখরোর মতো মেয়েটা এখন যেন মুখ আর চোয়ালে এক প্রত্যয়ী ছাপ নিয়ে শান্ত, সমাহিত হয়ে বসে আছে এক জীবনপণ লড়াই জিতবার প্রতিজ্ঞায়।

বাঙালির দেশপ্রেম ও চা

শেলী শাহাবুদ্দিন

"**চা** করে করে ভৃত্য নফর, নাম হারাইয়া হইল চাকর।
চা চেয়ে চেয়ে কাকা নাম ভুলে, পশ্চিমে চাচা কয়,
এমন চায়েরে মারিতে চাহে যে, চামার সে নিশ্চয়।"

এটি আমার নয়, যতদূর মনে পড়ে, উক্তিটি কাজী নজরুলের। খুব ছোটবেলায় পড়েছিলাম।

আমার কথা হ'ল, এখন যেসব বাঙালি বাংলাদেশে থেকে (বা অন্য কোথাও) 'এমন চায়েরে মারিতে' মারিতে মেরেই ফেলেছে, তারা শুধু চামার নয়, তারা দেশপ্রেমহীন নির্বোধ, তারা বাঙালির কলঙ্ক।

২০১৯ সালে দেশে গিয়ে এরকম অজস্র অকালকুষ্মান্ড বাঙালি দেখেছি ঢাকা শহরে। সংখ্যায় এরা বাড়ছে দ্রুতগতিতে, সেই সাথে দেশপ্রেম বিসর্জন দেওয়ার পুরস্কার পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে তাদের ব্যবসা।

চায়ের সাথে অবশ্যই দেশপ্রেমের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ইলিশের সাথে বা বাংলাদেশের, পোশাক শিল্পের সাথে দেশপ্রেমের সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের বিনিময়ে চা তৈরী হয়। সেই চায়ের প্রতি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের দেশপ্রেমহীন ব্যবসায়ীরা এখন কফিকে বুকে তুলে নিয়েছে। অথচ কফি বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর বৃহত্তম কফি উৎপাদক দেশ ব্রাজিল। তারপরই ভিয়েৎনামের অবস্থান। কফি বিক্রির অর্থের সিংহভাগ চলে যায় দেশের বাইরে (১)। কথাটা আমি ঢাকার বেশ কয়েকজন দোকানের মালিককে বলেছিলাম। তাঁরা কেবল ভাবলেশহীন মুখে নীরবে তা শুনে গেছেন।

ঢাকায় গেলে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ভালবাসি। সঙ্গে থাকে বাবলু (এখন আমার Friend, Philosopher & Guide)। পথে পথে ঘোরাঘুরির সময় বাবলু রীতিমত জিনিয়াস। কিন্তু পথশ্রমের ক্লান্তিকালে যথেষ্ট নয়। তার সাথে চাই চা। ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে যখন কোনও খাবার দোকানে গিয়ে চায়ের খোঁজ করি, তখন অধিকাংশ দোকানের মালিক (বা কর্মচারী) খুবই গর্বিত কণ্ঠে, এবং খানিকটা উদ্ধতভাবে ঘোষণা

করেন, "আমরা চা সার্ভ করি না, আমরা কফি সার্ভ করি।"

এইসব কফি প্রেমিকরা কেউ কেউ আমাদের প্রশ্ন শুনে অবাক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়। কেউ কেউ আবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেও তাকায়। বিরক্ত হয়ে একবার আমি এক দোকানিকে বলেছিলাম, "নিজের দেশের পণ্য 'চা' সার্ভ না করা কোন গৌরবের বিষয় নয়, বরং লজ্জার বিষয়; যেমন পাপের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা লজ্জার বিষয়, ঠিক তেমনই। তাই কথাটা একটু বিনয়ের সাথে বলতে পারলে ভাল হয়।"

ভদ্রলোক স্তম্ভিত! সম্ভবত তিনি জীবনে প্রথম এমন ধরনের কথা শুনলেন।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহবাগ গেটের পাশে 'কোহিনূর' নামে যে দোকান – সত্তরের দশকে সেটি প্রতিষ্ঠার পেছনে আমার একটা ভূমিকা ছিল। তখনকার প্রতিষ্ঠাতার ছেলে এখন সেই দোকান চালায়। মূলত চায়ের দোকান হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দোকানটি। তারাও এখন আর চা বানায় না। কিন্তু আমি গেলে খুব সম্মান করে। অন্য দোকান থেকে চা এনে দেয়।

আজিজ মার্কেটের সামনে ছোট্ট দোকানটাতে যে চা আছে বোঝার উপায় নেই। মুখ ফুটে চা চাইলে দোকানের মালিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন খোঁজেন। তারপর নিঃশব্দে চা বানিয়ে দেন। রহস্যটি কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমি তাদের রহস্যময় চা খাই। রহস্যময় হলেও তাদের চা খেতে বেশ ভালই।

বোধকরি পরিবেশ – আঁতেল এলাকায় থাকতে থাকতে এ লোকটির মধ্যে হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

নিউ মার্কেটে পরিশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ইনার সার্কেল, আউটার সার্কেল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন দোকানেই চা পাওয়া গেল না। শেষে দুই সার্কেলের মাঝখানে যে ভূতুড়ে গলিঘুঁজি থাকে, তার একটাতে খুব ছোট, সাধাসিধে নতুন একটা দোকানে চা পাওয়া গেল। মালিক নিজেই ছোট্ট টেবিল চেয়ার নিয়ে ক্যাশবাক্সে বসেন। তিনি আমার দুঃখ শুনে আন্তরিকতার সাথে বললেন, "আমার এখানে সব সময় চা পাবেন।"

সেই দোকানে চা খেতে খেতে মনে যেন একটু সান্ত্বনা বোধ করলাম। মনে হ'ল এদেশের সাধারণ মানুষগুলি এখনও বাঙালিই রয়ে গেছে। তাদেরই আছে বাঙালি অন্তর। শুধু সেই দোকানে চা খাওয়ার জন্য বাবলুকে নিয়ে আমি আরো একদিন নিউ মার্কেটে যাই, কোন প্রয়োজন ছাড়াই। আবার একবার সেই চা খেয়ে খুব ভাল লাগল। তবে বুঝলাম, বাংলাদেশে চা এখন ব্যাকস্টেজে, কেবল অন্ধগলিতেই ঘুরছে।

ব্যবসায়ীরা হয়তো দোষটা ক্রেতার ঘাড়ে চাপাবে। কিন্তু বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস এই যে, বাংলাদেশের গ্রাহকদের রুচি ব্যবসায়ীরা কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে।

"আমরা যা দেব খাও, নইলে গোল্লায় যাও।"

আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, চা আর কফি নিয়ে যেসব তথ্য গুগল টিপলে পাওয়া যায়, তাতে দেখা গেছে যে কফির চাইতে চায়ের উপকারিতা অনেক বেশি।

চা এবং কফি দুটিতেই যে ক্যাফিন আছে তা শুধু স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। ঘুম থেকে উঠে চা বা কফি খেলে তাই কাজের সুবিধা হয়। কিন্তু কফিতে ক্যাফিনের পরিমাণ চায়ের চাইতে বেশি। ফলে উত্তেজনা বেশি হয়। তাতে কতগুলি অসুবিধাও হয়। বিশেষত ঘুমের।।

একসময় সন্দেহ করা হতো যে কফি ক্যান্সারের একটা কারণ। এখন কফিকে সেই সন্দেহ থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত করা হয়েছে। সাময়িক বলছি, কারণ কফিতে সন্দেহজনক একটা উপাদান আছে। কিন্তু এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত যে চা বিভিন্ন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

কফি পার্কিনসন রোগ, ডায়াবেটিস টাইপ ২, ও লিভার রোগে উপকারী।

পক্ষান্তরে চা ক্যান্সারের ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, ওজন কমাতে সাহায্য করে, এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় (২)। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ দাবি করেন যে চা দাঁত ও শরীরের হাড়কে শক্ত করে, এবং অস্থিরতা বা anxiety কমাতে সাহায্য করে (৩)।

চা ও কফিতে পলিফেনল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট নামক কিছু রাসায়নিক আছে, যা শরীরে এইসব উপকারগুলি করে। কিন্তু কফির তুলনায় চায়ে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অনেক বেশি। আমাদের শরীরের ভেতরে শরীরের প্রাত্যহিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যান্ত্রিক আবর্জনার মতো কিছু রাসায়নিক পদার্থ জমে। সেগুলি শরীরে নানা ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রধানত শরীরের ভেতরে জমে ওঠা এই আবর্জনাগুলিকে সরিয়ে প্রদাহ

নিবৃত্ত করে| সবুজ চায়ে এর পরিমাণ থাকে বেশি, কিন্তু সাধারণ চায়েও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যথেষ্ট পরিমাণে থাকে | অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের আর একটি উপকারিতা, বয়সের কারণে শরীরের বার্ধক্যজনিত পরিবর্তন প্রতিরোধ করা (antiaging property) (৪,৫)|

কফি একটি অ্যাসিডিক উপাদান| সেজন্য যাঁরা পেটের পীড়ায় ভোগেন, তাঁদের কফি সহ্য নাও হতে পারে| কোন কোন কফি কলেস্টরল বাড়ায়, এবং কফি হাড়ের দুর্বলতার কারণও হতে পারে (৪)|

সম্প্রতি চায়ে L-theanine নামে বাড়তি একটি উপাদান দেখতে পাওয়া গেছে, যা কফিতে নেই| এই থিয়ানিন ক্যাফিনের সাথে মিলিত হয়ে মস্তিষ্কে মনোসংযোগের কাজে সাহায্য করে (৬)| অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য কফির তুলনায় চা শ্রেষ্ঠ|

ইংরেজরা চা মুখে নিয়ে ভারতে এসে দার্জিলিঙে চায়ের বাগান করল| হয়তো সেই চা খেয়েই ব্রিটিশ যুগে বাঙালির রেনেসাঁস শুরু| আর আজ সেই 'চা'কেই মারিতে চায় চামার বাঙালি!

মনে পড়ল শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' ছবির একটা গান – নায়ক স্বামী বিছানায় বাবু হয়ে বসেছেন| নায়িকা স্ত্রী ধূমায়িত চা এনে দিয়েছেন স্বামীর হাতে | নায়ক সেই চায়ে চুমুক দিয়ে মনের সুখে গেয়ে উঠলেন,

"আহা, কী যে আরাম সে তো মনই জানে,
এই চায়ের গন্ধ সে যে মেজাজ আনে|
এই চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হতো,
সাঁতার কাটিয়া তাতে মনের মতো,
স্বর্গে যেতাম, আমি স্বর্গে যেতাম, মনের সুখে,
আহা, চায়ের গুণ কী আর কহিব মুখে!"

*****

১. List of countries by Coffee production. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_coffee_production
Downloaded on 4/20/21

২. Coffee Vs. Tea: Is one Better for Your Health? - on December 23, 2016. From the WEBMD ARCHIVES. December 23, 2016.
https://www.webmd.com/foodrecipes/news/20161223/coffee-vs-tea-isonebetterhealth#:~:text=Cimperman%20said%20drinking%20tea%20has,and%20heart%20problems%2C%20Cimperman%20says
Downloaded on 4/20/21.

৩. Ten Benefits of Drinking Tea over Coffee. Chris Haigh.
https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-drinking-tea-over-coffee.html
Downloaded on 4/20/21

৪. Coffee or Tea? An RD Weighs in on Which is Healthier. By Cynthia Sass, MPH, RD. December 04, 2015.
https://www.health.com/food/coffee-or-tea-an-rd-weighs-in-on-which-is-healthier
Downloaded on 4/20/21

৫. Tea Vs. Coffee: It's the Ultimate Smackdown. By Christine YU, September 4, 2018.
https://www.womenshealthmag.com/food/a22855073/tea-vs-coffee/
Downloaded on 4/20/21

৬. Tea or coffee Which is better for you? BBC Food.
https://www.bbc.co.uk/food/articles/teaversus_coffee

অধিকার

অযান্ত্রিক

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে বোধহয়, তুহিনার খুব ভয় লাগে এখন অপ্রতিমকে। সম্পর্কে দেওর হলেও ও খুব ভাল করে জানে যে অপ্রতিম ওকে বৌদির নজরে দেখে না। নিচের ঘরে মা বাবা ঘুমোতে যাবে এবার, তারপরই শুরু হবে আতঙ্ক। গত তিন মাস ধরে ফোনে ক্রমাগত ভালবাসার কথা জানিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে অপ্রতিম। সেদিন যে কেন বাবা মা জোর করে প্রতিম, মানে অপ্রতিমের দাদার সাথে বিয়েটা দিয়ে দিল সেটা আজও বুঝতে পারেনি তুহিনা। হয়তো প্রতিমের সাথে পুরোপুরি প্রেম ছিল না, তবে একটা ভাললাগা ধীরে ধীরে তৈরি তো হচ্ছিল। তাকে বিয়ে করায় বাবা মা শান্তি পায়। আর নিশ্চিত ভবিষ্যত বলেও তো একটা কথা আছে। অপ্রতিম চাকরি করে না, বেকার, সেখানে প্রতিম সরকারী চাকুরে। তাই বিয়েতে অমত করেনি তুহিনা। আর বিয়ের পর বুঝেছে তার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। প্রতিম নিজের থেকেও ওকে বেশি ভালবাসে। কিন্তু মাস তিনেক আগে ওর চলে যাওয়াটা? এই সবই ভাবছিল তুহিনা প্রতিমের মালাপরা ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে।

বাড়িতে ঢুকতেই সেই চেনা দৃশ্য – মা বাবা নিচের ঘরে ঘুমানোর তোড়জোড় করছে। ওপরে তুহিনা, মানে ওর বৌদির ঘর, আলো জ্বলছে – মানে জেগে আছে। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল অপ্রতিমের। তুহিনা এখন আর বৌদি নয়, দাদা প্রতিমের বিধবা, ওর ভালবাসা। তিন বছর আগে ও বেকার বলে তুহিনা দাদার হাত ধরেছিল। কিন্তু ও তো জানত অপ্রতিম ওকে ভালবাসে। সেই ঠকে যাওয়ার যন্ত্রণা ভুলতে অপ্রতিম মদে ডুবে গেছে। তখন বেকার ছিল, কিন্তু এখন ট্রাক চালায়, মাছের ট্রাক – অন্ধ্র থেকে মাছ নিয়ে আসে, কলকাতা থেকে ফুল নিয়ে যায়। কয়েক মাস বাদে বাদে বাড়ি ফেরে। এবার এসেছে তিন মাস বাদে। তিনমাস আগে এসেছিল, যেদিন দাদার দুর্ঘটনা হয়েছিল। তারপর আজ। তবে আজ আর ও মেনে নেবে না। জোর করেই অধিকার করবে তুহিনাকে। তুহিনা শুধু অপ্রতিমের। দাদার সাথে বিয়ে হয়ে বাড়ি আসার পর যতবার দেখেছে তুহিনাকে, বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে। নিচের ঘরের কাজ মিটিয়ে উপরে উঠে এল অপ্রতিম। ঘুমিয়ে আছে বাবা মা, শান্তির ঘুম। ওই তো তুহিনা আর দাদার ঘর – পা টিপে টিপে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অপ্রতিম। দরজার দিকে পিঠ করে খাটের ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে তুহিনা, মানে ওর তুহি। হ্যাঁ পাচ্ছে, তুহিনার শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। মদের নেশা কেটে অন্য নেশা চেপে বসেছে মাথায়। আজ কেউ নেই ওকে আটকাবার – মা, বাবা, দাদা কেউ না। এবার তুহিনা শুধু অপ্রতিমের।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে পিছন ফিরতেই দেখল তুহিনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। সে দৃষ্টিতে প্রেম নয়, একটা ভয় খেলে বেড়াচ্ছে। তাহলে তুহিনা কি বুঝতে পেরে গেছে ও কী করতে এসেছে। অপ্রতিম দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চাইল তুহিনার দিকে। কিন্তু একী! একপাও নড়তে পারছে না কেন? কেউ পিছন থেকে টেনে ধরেছে তাকে। অপ্রতিম চমকে পিছন ফিরল – কই, কেউ তো নেই! দরজাও তো বন্ধ!

ঠিক তখনই ওর কানে এল, "ভাই তুই? তুই এমনটা করতে পারলি?" গলা শুকিয়ে আসছে অপ্রতিমের। নিচে মা-বাবাকে শেষ করার সময়ও এতটা ভয় লাগেনি। এই গলা, এই ডাক অপ্রতিম চেনে – এটা ওর দাদা, প্রতিমের স্বর; যাকে তিন মাস আগে নিজের গাড়ির তলায় পিষে...

না না, এটা কী করে হয়? সামনের দিকে তাকাতেই দম বন্ধ হয়ে এল অপ্রতিমের। সারা ঘরে একটা বোঁটকা গন্ধ, সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরই দাদা, প্রতিম। মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত, মুখের একটা দিক থেঁতলে গেছে। সরু লিকলিকে দুটো হাত চেপে ধরেছে অপ্রতিমের গলা। চেপে বসছে, চেপে বসেছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না অপ্রতিম। দুই হাতের সর্ব শক্তি দিয়ে ছাড়াতে চাইছে হাতের বাঁধন, কোনো লাভ হ'ল না! কিছু ধরাই যাচ্ছে না, কিন্তু দম আটকে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখছে অপ্রতিম। আবার সেই স্বর, "ভাই তুই শেষমেষ এতটা নিচে নামলি? তুহিনা তোর..."

কথাগুলো ঠিক পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না অপ্রতিম। হঠাৎ একটা ধপ করে শব্দ কানে এল। গলায় চাপটা আর নেই, শরীরটাও বেশ হালকা লাগছে। ওই তো তুহিনা দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু অমন মুখে হাত ঢেকে কাঁদছে কেন? অপ্রতিম তুহিনার

দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পায়ে কিছু একটা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে| কীসে হোঁচট খেল দেখতে গিয়ে দেখল একটা দেহ, ওর দিকেই মুখটা ঘোরানো – চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, জিভটাও বেরিয়ে এসেছে এক হাত| মুখটা খুব চেনা, খুউব! অবিকল ওর মতোই| বুকের কাছে হিম স্রোত বয়ে গেল অপ্রতিমের, তাহলে কি...

আবার কানে এল, "ভাই, চল এবার তো আমাদেরও যেতে হবে!"

সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা

সংগ্রামী লাহিড়ী

"শুনছ, বাইরে ওরা কারা? কারা ওখানে ঘোরাঘুরি করছে?" সুমনার উত্তেজিত গলা ভেসে এল| অমলেন্দু কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার হাউমাউ করে ওঠে, "ওরে বাবা, হাতে আবার বন্দুক! ওগো মাগো, ডাকাত নাকি গো?"

চটকা ভেঙে গিয়ে অমলেন্দু চমকে ওঠে, "অ্যাঁ? ডাকাত? কোথায়? ক্ কে, কে, কার কথা বলছ?"

- "কথা শোনো একবার! আমি কি ওদের চিনে রেখেছি? হুমদো হুমদো লোকগুলো কী যেন করছে ওখানে| কাউকে খুন করে পুঁতে দিচ্ছে না তো? উরি বাবারে, আবার টর্চ ফেলে এদিকেই দেখছে| ওগো কী হবে গো? এ কোন জায়গায় এনে ফেললে আমাকে?" সুমনার আর্তনাদ উত্তরোত্তর বাড়ছে|

সারাটা দিন বড্ড খাটনি গেছে| সন্ধ্যের ঝোঁকে অমলেন্দু সবে একটু হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল। অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের ধারে আমেরিকার এই উত্তর-পুব অঞ্চলে গরমকালে সন্ধ্যের অন্ধকার নামতে বেশ দেরি হয়| সূয্যিমামা আকাশের মৌরসিপাট্টা ছেড়ে অস্ত যেতেই চান না| যদিও বা যান, দিগন্তরেখার নিচে ঝুলে থাকেন অনেকক্ষণ| মায়াময় এক নরম গোধূলি আলোয় ভরে থাকে চরাচর|

তবে এখন সে আলো আর নেই, অন্ধকার নেমেছে ডেনভিলের উঁচুনিচু পাহাড়ি ঢালে| ডিনার শেষ| সোফায় বসে অমলেন্দুর চোখদুটো একটু জুড়ে এসেছিল | চমকে তাকিয়ে দেখল, ঘড়িতে দেখাচ্ছে রাত সাড়ে দশটা | বিরাট ফ্লোর-টু-সিলিং জানলার কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে হীরের কুচি ছড়ানো আকাশ| চাঁদ নেই, কিন্তু তারার আলোয় আবছা হয়ে আছে ঢেউখেলানো উঁচুনিচু ফাঁকা মাঠ – উইলো, মেপল আর ওক গাছের জঙ্গল| নতুন গড়ে উঠছে জায়গাটা| প্লটে প্লটে বিক্রি হচ্ছে জমি| তারই একটা কিনে নিয়ে তিলে তিলে এই বাড়ি বানানো|

নতুন সায়েন্টিস্ট অমলেন্দু এদেশে এসেছিল পিএইচডি করতে | ডিগ্রি পেয়ে এখন ওই কলেজেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর| সদ্য বিয়ে করে সুমনাকে নিয়ে প্রবাসে সংসার পেতেছে| গরীব মাস্টারের পকেটের জোর কম, কিন্তু

তা বলে নিজের একটা বাড়ি হবে না? সাধ আর সাধ্যের মধ্যে মিলমিশ হ'ল ডেনভিলের এই নতুন পত্তন হওয়া শহরে এসে। লোন-টোন করে এক একরের মতো জমি কেনা হ'ল। তাতে তৈরী হ'ল খোলামেলা বাড়ি। নিজেদের পছন্দমতো ডিজাইনে, শখ মিটিয়ে সুন্দর দোতলা বাড়ি, সামনে দিয়ে চলে গেছে চওড়া রাস্তা, পিছনে বিরাট ব্যাকইয়ার্ড। এমনকী অতিথিদের জন্যে আলাদা পার্কিং রাখা আছে, একসঙ্গে অনেক অতিথি এলেও অসুবিধে নেই, অনেকগুলো গাড়ি একসঙ্গে পার্ক করা যাবে।
সবই হ'ল, শুধু জায়গাটা বড়ই নির্জন। ধারেপাশে পড়শি নেই। কোনো কোনো জমিতে বাড়ি উঠছে। বাকিটা ধু ধু মাঠ। সামনের চওড়া রাস্তার ওধারেই ঘন জঙ্গল। গা ছমছম করে বইকি!
নতুন বাড়ি বানিয়ে থাকতে এসে এটাই হয়েছে সমস্যা। সুমনা ভয়ে মরে। দিনেরবেলা তবু ঠিক আছে, রাত হলেই যেন নির্জনতা গিলতে আসে। কলকাতার বিডন স্ট্রিটের তুমুল হৈ-হট্টগোলের মাঝে বড় হওয়া সুমনার অসুবিধে হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?
রাত হলেই তাই সে বাড়ির সবকটা দরজা বন্ধ করে, জানলাগুলো আরেকবার চেক করে নেয়, কোনোটা খোলা নেই তো? খোলা থাকার অবশ্য প্রশ্নও নেই। নিশ্ছিদ্র কাঁচের ঘেরাটোপে শীতে সেন্ট্রাল হিটিং চলে, গরমে এয়ারকন্ডিশনার। আবহাওয়া ভাল থাকলে অমলেন্দুর মাঝে মাঝে সাধ যায় বাইরের তাজা হাওয়ার একটু পরশ পেতে। দেখতে পেলেই সুমনা হৈ হৈ করে ওঠে, "বন্ধ করো, বন্ধ করো!"
ঝটপট সব দরজা জানলা আবার বন্ধ করে দেয় অমলেন্দু। তাও কি রক্ষে আছে? মাঝে মাঝেই সুমনার গলায় সন্দেহের সুর, "ব্যাকইয়ার্ডে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না? কারা যেন হাঁটাচলা করছে মনে হচ্ছে!" কিংবা, "ওই যে লোকটা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে সাইডওয়াক দিয়ে, কীরকম করে আমাদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে দেখেছ? কেমন যেন হাবভাব!"
শুনে শুনে অমলেন্দু খানিক বিরক্ত। সুমনাকে বুঝিয়ে পারে না, নিউ জার্সির এসব ছোট ছোট মফস্বল শহরে ক্রাইম রেট খুব কম, নেই বললেই চলে। সারারাত বাড়ির দরজা খোলা রাখলেও কেউ ঢুকবে না। চুরিডাকাতির কোনো সম্ভাবনাই নেই, হলেও লোক্যাল পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে।
সুমনা কড়া চোখে তাকায়, "তাই বলে আমাকেও বাড়ির দরজা খুলে রাখতে হবে? জানো না, সাবধানের মার নেই?"
অমলেন্দু চুপসে যায়, কথা বাড়ায় না আর।
এভাবেই চলছিল তাদের যুগলজীবন, নতুন বাড়িতে।

আজ ব্যাপারটা যেন সীমা ছাড়িয়ে গেল। বন্দুক হাতে মানুষ? সারাদিন উল্টোপাল্টা ভেবে ভেবে সুমনার কি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল? সে কথা বলতেই মুখঝামটা খায়, "কষ্ট করে একবার এদিকে এসে দেখলেই তো পারো, তাহলেই বুঝবে, কার মনের ভুল!"
অগত্যা সোফার আয়েস ছেড়ে উঠতে হয়। এবং সুমনার পাশটিতে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু চমকে ওঠে, সত্যিই জঙ্গলে বিশালদেহী কারা যেন ঘোরাঘুরি করছে। হাতে বেশ শক্তপোক্ত বন্দুক। আবছা আলোতেও বুঝতে অসুবিধে হয় না!
গলা শুকিয়ে কাঠ। এসবের মানে কী? এদের মতলবটাই বা কী? বাড়িতে যদি ঢুকে আসে? বন্দুকধারীদের তুলনায় সে নেংটি ইঁদুরটি। তাকে দু-আঙুলে তুলে আছাড় মারতে পারে ওরা!
ভীত অমলেন্দু ফোনের দিকে দৌড়োল।
ওহো, বলাই হয়নি, এ হ'ল সেই ষাটের দশক, যখন সবার মুঠোয় একখানি ফোন থাকত না। নিউ জার্সিতেও মানুষজনের বসতি কমই ছিল। বাঙালির সংখ্যা তো হাতে গোনা যায়। সবাই সবাইকে চেনে, সাধ্যমত সাহায্য করে। প্রবাসে এঁরাই আত্মীয়, বা আত্মীয়ের থেকেও বেশি।
অমলেন্দুও সেই স্নেহের আশ্রয় পেয়েছে। প্রবীরদা শুধু বয়েসেই বড় নন, ভূয়োদর্শী মানুষ। বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে এদেশে চলে এসেছিলেন। এঞ্জিনিয়ার প্রবীরদা আজ একটি কারখানার মালিক। বাড়িতে লাগানোর সিকিউরিটি ডিভাইস বানায় তাঁর সংস্থা। বাড়ির সিকিউরিটির ব্যাপারে তাঁর মতো আর কে-ই বা জানবে!
"প্রবীরদাআআ..." টেলিফোনের তার বেয়ে আছড়ে পড়ে অমলেন্দুর গলা। পারলে তার বেয়ে সে নিজেই পৌঁছে যায় প্রবীরদার কাছে। "বন্দুক! উফ!"
"কী হল কী? এত রাতে? গলাটা তোর এমন শোনাচ্ছে কেন? সুমনা ঠিক আছে?" প্রদীপদা চিন্তায় পড়ে যান।
"হ্যাঁ হ্যাঁ, সুমনাই তো ওদের প্রথম দেখল! কী সাঙ্ঘাতিক! কীইইইই কাণ্ড!"
"কী দেখল? কী সব বলছিস আবোলতাবোল? ভূত দেখল

নাকি?”

সুমনা এবার রিসিভারটা কেড়ে নেয় | ভয়ে অমলেন্দু তোতলাচ্ছে | এই লোক কিনা তাকে উপদেশ দেয়, বলে, সাহস সঞ্চয় করো!

“আমি বলছি প্রবীরদা |” আদ্যোপান্ত ঘটনার বিবরণ দেয় সে৷ প্রবীরদা মন দিয়ে শোনেন |

- “বাড়ির সামনে শুধুই জঙ্গল, নাকি আর কোনো বাড়িঘর আছে?”

- “না, শুধু আমরাই বাড়ি করেছি | আর কেউ নেই আপাতত |”

- “জঙ্গলে জন্তু-টন্তু দেখিসনি? বুনো জন্তু? এই যেমন ধর হরিণ, খেঁকশিয়াল...”

কথা শেষ না হতেই সুমনার দুঃখ উথলে ওঠে, “নেই আবার? পালে পালে হরিণ! কত গোলাপ গাছ লাগিয়েছিলাম, হরিণ এসে স-অ-ব একেবারে মুড়িয়ে দিয়ে গেছে! তাড়ালেও যায় না | দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে!”

- “আঃ, এখন ওসব রাখো দিকি! গোলাপ গাছ! প্রাণে বেঁচে থাকলে তবে না গোলাপফুল!” অমলেন্দু অধৈর্য |

প্রদীপদা হেসে ফেলেন, “ভয় নেই, তোরাও বাঁচবি, তোদের গোলাপ গাছও বাঁচবে বলেই মনে হচ্ছে |”

- “অ্যাঁ?” দুজনেই আশ্চর্য!

- “বন্দুক নিয়ে লোক ঘোরাঘুরি করছে মানে ওরা ওই জঙ্গলে শিকারের পারমিট নেবে | হরিণ, খরগোশ, বনবেড়াল মারবে |”

- “সে কী? আমার বাড়ির সামনে শিকার করবে?” সুমনার বাকরোধ হয়ে আসে |

“আহা, তারা কি আর তোর বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে গুলিগোলা চালাবে? তারা যাবে দূরের জঙ্গলে | কিন্তু পারমিট দেওয়ার আগে টাউন থেকে তোকে ডেকে পাঠাবে | তোর আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইবে |”

“নিশ্চয়ই আপত্তি আছে, একশোবার আপত্তি আছে! বন্দুক! ওরে বাবা!” অমলেন্দুর ভয় কাটছে না |

সুমনা খ্যাঁক করে ওঠে, “আর আমার গোলাপ গাছ? হরিণ এসে কেবল মুড়িয়েই যাবে? এর একটা বিহিত হওয়ার দরকার নেই?”

“টাউনে কথা বলতে যাবি যেদিন, আমায় বলিস | একা যাসনি | কন্ট্রাক্টের ক্লজগুলো খতিয়ে দেখতে হবে |” প্রদীপদা ফোন রেখে দেন |

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করে দিন দুয়েকের মধ্যেই টাউনের চিঠি এসে হাজির হয় |

মহাশয় ও মহাশয়া,

আপনার বাসগৃহের লাগোয়া জঙ্গলে অগুন্তি হরিণ | কোনো খাদক না থাকার ফলে তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, এবং টাউনশিপের মধ্যে তারা সমস্যা তৈরী করছে | তাই টাউন সেখানে শিকারের পারমিট দিতে চায় | মহামান্য মেয়র এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান, অমুক দিন, তমুক সময়ে | যাঁদের পারমিট দেওয়া হবে, সেই শিকারীরাও হাজির থাকবেন... ইত্যাদি ইত্যাদি |

নির্দিষ্ট দিনে দুজনে মিলে প্রদীপদাকে সঙ্গে করে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে হাজির হয়েছে | মেয়র মানুষটি অতি ভদ্র | সবাইকে কফি খাওয়ালেন | প্রদীপদার দিকে তাকিয়ে মুখে প্রশ্নচিহ্ন আঁকতেই অমলেন্দু ফট করে বলল, “ইনি আমার অ্যাটর্নি |”

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নচিহ্ন বদলে গেল সমীহের দৃষ্টিতে | অ্যাটর্নিকে এদেশের মানুষ ঈশ্বরের পরেই ভক্তিশ্রদ্ধা করে | তাঁরা হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করার ক্ষমতা রাখেন |

শিকারীদের সঙ্গে টাউনের কন্ট্রাক্ট হবে, তার ড্রাফট দেওয়া হ’ল সবাইকে | প্রদীপদা স্থিরবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ মানুষ | সময় নিয়ে কন্ট্র্যাক্টের ক্লজ পড়লেন | বিচার বিবেচনা করে তাতে আরো দু-একটা বাড়তি ক্লজ ঢোকালেন | আর জানতে চাইলেন, শিকারকালে বাড়ির কোনো ক্ষতি হলে কে দায়ী হবে?

মেয়র আশ্বাস দিলেন, যতটা সম্ভব শিকারীকুল শুধু তীরধনুকেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবেন | তাছাড়া তীর ছুটবে সবসময় মাচার ওপর থেকে নিচে জমির দিকে | আড়াআড়ি তীরচালনা নৈব নৈব চ | “কী বলেন আপনারা?” ঘাড় ঘোরালেন শিকারীদের দিকে | বিশালদেহী মানুষগুলি অতি ভদ্র | একযোগে সবাই যীশুর দিব্যি দিয়ে বললেন বাড়িমালিকের জান-মালের দায়িত্ব সম্পূর্ণই তাঁদের |

অমলেন্দু আবছা চিনতে পারছে, এঁদেরই কয়েকজন ‘সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যায়’ তার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন | আশ্বাসের সঙ্গে উপরি মিলল হরিণের মাংসের অফার |

- “আমরা গোটাকয়েক মেরে ফ্রিজারে রেখে দিয়ে সারা

গরমকাল বারবিকিউ করি। বাড়ির মালিক হিসেবে সে মাংসের ভাগ তো আপনারা পেতেই পারেন, ন্যায্য পাওনা!”
সুমনা আঁতকে উঠে বলতে যাচ্ছিল, “কী সর্বনাশ!” প্রদীপদার রামচিমটি খেয়ে থেমে গেল।
বাইরে এসে প্রদীপদা এই মারেন তো সেই মারেন, “টাটকা হরিণের মাংসের অফার ফিরিয়ে দিচ্ছিলি? কোন গাঁয়ের ভূত রে তুই? বারবিকিউ করে একবার খেয়ে দেখিস দিকি – জিভে লেগে থাকবে।” গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, “অ্যাটর্নির ফি-টা কিন্তু ফাঁকি দিসনে ভাই, হরিণের মাংস যেন বাড়িতে নিয়মিত পৌঁছায়, এই বলে গেলুম, হ্যাঁ!”
ধুলো উড়িয়ে প্রদীপদা অদৃশ্য হলেন।
দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।
- “আর ভয় করবে না তো?” অমলেন্দু মিচকে হাসে।
কাছটিতে ঘন হয়ে আসে সুমনা, “নাঃ!”
সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সোনাঝরা গোধূলির আলোয় বাড়িটাও হাসতে থাকে, নিশ্চিন্ত হাসি।

সম্পর্ক

বীরেশ্বর মিত্র

দৌড়োতে দৌড়োতে এসে ট্রেনটা ধরলাম। কুলির মাথা থেকে মালপত্র নামাতে না নামাতে ট্রেন চলতে শুরু করল, কোনরকমে কুলিকে টাকাটা দিতে পেরেছিলাম। দুরন্ত এক্সপ্রেস ছাড়ল একদম ঠিক সময়ে। নিজের মনে গজগজ করতে করতে জিনিসগুলো টেনে নিয়ে নির্দিষ্ট কামরায় হাজির হলাম, ফার্স্ট ক্লাসে। একটা বড় সুটকেস আর দুটো বড় বড় ব্যাগ – ঠাসা, প্রত্যেকবার কলকাতা থেকে ফেরার সময় একই অবস্থা হয়!

বার্থ-এর তলায় জিনিসপত্র গুছিয়ে সিটে বসার পর নজর পড়ল ওঁদের দিকে। একটি বয়স্ক দম্পতি; সুন্দর চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট ফুটে ওঠে। মনে হ'ল মহারাষ্ট্রিয়ান পরিবার। এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলেন। একটু বকুনির সুরে ভাঙ্গা বাংলায় বললেন, “আর একটু হলেই তো ট্রেনটা মিস করতেন, একটু আগে এলে কী ক্ষতি হতো? আপনারা ইয়ং, তাই বড্ড বেশী রিস্ক নেন। আমরা দেখুন আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম।” সত্যি তো, দোষটা আমারই, আমি সে বুঝতে পারছি। ভদ্রমহিলা সুন্দরভাবে সামলে দিলেন; বললেন, “নিশ্চয়ই ট্যাক্সি গোলমাল করেছে!” ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে কথা শুরু করলেন, নাম বললেন পরিমল যোশী। আর ভদ্রমহিলার নাম ঊর্মিলা। মনে পড়ে গেল, রামায়ণের বিশেষ চরিত্র লক্ষ্মণের স্ত্রী, পরমা সুন্দরী। এই ভদ্রমহিলাও তাই। কীভাবে সম্বোধন করব বুঝতে না পেরে বলে ফেললাম, “স্যার ও মাদাম, অত্যন্ত দুঃখিত।”
- “ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওই সম্বোধন চলবে না, সহজ কিছু ভাবো।”
বললাম, “ঠিক আছে, তাহলে ভাইসাব আর ভাবি বলি?”
ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন, “আমাকে তুমি দিদি বলতে পারো, আর ওঁকে দাদা। কী চলবে তো?”
খুব খুশি হলাম। নিজের দিদি নেই, একসঙ্গে দুজন নিকট আত্মীয় পেয়ে গেলাম। ফ্লাস্ক থেকে তৈরি চা ঢেলে দিলেন আর সঙ্গে কিছু টুকটাক খাবার। কথায় কথায় জানতে পারলাম ভদ্রলোক ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সিনিয়র ম্যানেজার হয়ে অবসর নিয়েছেন

প্রায় বছর দশেক আগে; এখন বয়স সত্তর। চেহারা দেখে বয়স আঁচ করার উপায় নেই । দুবার কলকাতায় পোস্টিং ছিল । কলকাতা শহর এবং বাঙালিদের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা লক্ষ্য করলাম। বাংলা ভাষা বলতে খুব ভালবাসেন। এক ছেলে; কৃতী, আই টি এঞ্জিনিয়ার। বিদেশে আছে বছর কুড়ি, সুন্দরী বৌ, এক মেয়ে – এম বি এ পড়ে, ওখানেই । বছরে একবার দেশে আসার চেষ্টা করে।

দাদার কথা শেষ হতেই দিদি ওঁদের মেয়ের কথা বলতে শুরু করলেন । এক মেয়ে, একই শহরে থাকে । জামাইয়ের ছোটখাটো ব্যবসা । ভালই চলে । দিদি কলেজে পড়াতেন, ইতিহাস । সেও অনেকদিন আগেকার কথা । নিজেকে সুন্দর রেখেছেন এবং কথা বলেন খুব সুন্দর করে, চেহারা দেখে মনে হয় এককালে নিশ্চয়ই নাচ গান করতেন। আস্তে আস্তে জানা যাবে। দিদি খুঁটিয়ে আমার বাড়ির কথা জানতে চাইলেন এবং জেনেও নিলেন। গল্প করতে করতে কোথা দিয়ে ঘন্টা তিনেক কেটে গেল। একটা বড় স্টেশন আসছে বুঝলাম। টাটানগরে ট্রেন থামল। বিসলারির বোতল কিনতে ট্রেন থেকে নামলাম, চারটে জল কিনে উঠে পড়লাম ট্রেনে। দুটো ওঁদের জন্য আর দুটো আমার।

দিদি বললেন, "দেরি করলে আবার বকুনি খেতে।"

দিদি পয়সা দিতে চাইলেন, জলের জন্য কি পয়সা নেওয়া যায়? আর তাছাড়া এখন তো দাদা-দিদির সম্পর্ক হয়ে গেছে।

এইভাবে স্টেশনে নামা নিয়ে ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ে যায়। বাবা রেলে বড় চাকরি করতেন। গরমের ছুটির সময় প্রত্যেক বছর বেড়াতে যেতাম । এক একবার এক একদিকে। খুব মজা হতো। বড় স্টেশন এলেই নামতাম। বোন ও মা দুজনেরই ভীষণ আপত্তি ছিল । বাবার পেছন পেছন নামতাম। স্টেশনে নেমে লোকজন দেখতে খুব ভাল লাগত। একবার ওই রকম স্টেশনে নামার পর ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল, সেবার বাবার কাছে খুব বকুনিও খেয়েছিলাম । বিয়ের পরও একই অবস্থা। মাধুরী আর শিল্পীর ভীষণ আপত্তি, শিল্পী তো কান্না জুড়ে দিত।

যাইহোক, দিদিদের একটা নীচের আর একটা উপরের বার্থ; আমার নীচের। বললাম, "কোন চিন্তা করো না দিদি, আমি ওপরের বার্থে শুয়ে পড়ব । আমার কোন অসুবিধা হবে না । তোমরা আরাম করে নীচে থেকো ।" দুজনের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা দেখা গেল। সাড়ে বারোটা নাগাদ ওঁরা লাঞ্চ করতে বসলেন। দুই টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার, বাড়ি থেকে আনা। নিরামিষ । আমাকেও খাওয়াতে চাইলেন, কিন্তু আমার তো চিকেনকারি আর ভাত অর্ডার দেওয়া আছে। দেখলাম দিদি খুব যত্ন করে গুছিয়ে দাদাকে খাবার দিলেন, খাবার আগে ওষুধ, হাত মোছার তোয়ালে, সুন্দর পরিপাটি ব্যবস্থা – দেখেও ভাল লাগল । ইতিমধ্যে আমারও খাবার এসে গেল । ভালই বানিয়েছিল চিকেনকারি। খাবার খেয়ে ওপরের বার্থে উঠলাম একটা পুজোসংখ্যা হাতে নিয়ে । দেখলাম দিদি সুন্দর করে বিছানা পেতে দাদাকে শুইয়ে দিলেন।

ট্রেনের দুলুনিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙ্গল, দেখি প্রায় পাঁচটা। নীচে তাকিয়ে দেখলাম দাদা আর দিদি পাশাপাশি বসে নিম্ন স্বরে কথা বলছেন, মিষ্টি হাসি দুজনের মুখে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে দিদি আমাকে ইশারায় নামতে বললেন। আমরা চা খাব এখন, তুমিও এসো। আপত্তি করলাম না। চায়ের সঙ্গে দিলেন মুখরোচকের চানাচুর।

গল্প শুরু হ'ল। আগের সঙ্কোচটা অনেকটা কেটে গেছে। দাদা দুঃখ করছিলেন এবার বেলুড় মঠে যাওয়া হয়নি বলে । কলকাতায় থাকাকালীন এবং পরবর্তীকালে যখনই কলকাতায় গেছেন, বেলুড় মঠে অবশ্যই গেছেন । এইবারই বিয়েবাড়ির ব্যস্ততায় যাওয়া হয়নি। রামকৃষ্ণদেবের বিরাট ভক্ত তাঁরা। দুজনেই অনেক পড়াশুনা করেছেন এই বিষয়ে। দিদির রামকৃষ্ণ কথামৃত খুব ভাল লাগে বললেন। দাদা বাংলা নাটকের অনুরাগী, বিশেষ করে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রর নাটক খুব পছন্দ করতেন – তাঁদের অভিনীত সব নাটকই দেখতেন। এবার একটা পছন্দের বিষয় পাওয়া গেল। আমিও নাটক পাগল। 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়' নিয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। 'নান্দীকার'-এর 'তিন পয়সার পালা'ও তিনি দেখেছেন । পরবর্তীকালে মারাঠিতেও হয়েছে নাটকটি, সুপার হিট হয়েছিল । অবশ্য এখনকার নাটক এবং নাট্য আন্দোলন নিয়ে খুব একটা ওয়াকিবহাল নন।

ইতিমধ্যে কখন বিলাসপুর এসে চলেও গেছে। একবার খেয়াল হয়েছিল, কিন্তু দিদি তেমন আমল দেননি। দিদির সঙ্গে কথা বলবার জন্য ছটফট করছিলাম। শিবাজী মহারাজ সম্পর্কে

জানবার খুবই কৌতূহল ছিল। সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন, কী করে রাজত্ব সামলাতেন শিবাজীর মতো এত বড় একজন যোদ্ধা এবং বীর। তাঁর রণনীতি ও দল পরিচালনা করার অসাধারণ ক্ষমতা ইতিহাসে পড়েছিলাম; কিন্তু দিদির মুখে শুনতে খুব ভাল লাগছিল। এত সুন্দর, মিষ্টি করে গুছিয়ে কথা বলতে আগে কখনো শুনিনি। হিসেব করে দেখলাম প্রায় আমার মায়ের বয়সী তিনি। মা-ও আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি দিদির প্রেমে পড়ে গেলাম। অদ্ভুত এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাল লাগা, যেখানে প্রেম এবং পূজা এক হয়ে যায়। এ এক অনির্বচনীয় আত্মিক অনুভূতি। দিদির কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রশ্ন হারিয়ে যাচ্ছিল, উত্তরও কানে আসছিল না। দিদি বিষয় পরিবর্তন করাতে টনক নড়ল। দিদি জিজ্ঞেস করছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নৃত্যনাট্য দেখেছি কিনা। নিশ্চয়ই দেখেছি। প্রায় সবই দেখেছি । শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, মায়ার খেলা। দিদি শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন, উনি এককালে নাচতে খুব ভালবাসতেন এবং প্রায় সব নৃত্যনাট্যতেই মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন। শুনে খুব ভাল লাগল। এই বয়সেও ওঁর চলাফেরায় এক ছন্দ আছে। সুন্দর ফিগার বজায় রেখেছেন। গানও করতেন এককালে, এখন আর চর্চা নেই; কিন্তু মনেপ্রাণে ভালবাসেন সেসব।

দাদা ও দিদির মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর বোঝাপড়া, একজন আর এক জনের পরিপূরক। এরকম আদর্শ সম্পর্ক আগে কখনও চোখে পড়েনি। আমি ঠিক, তুমি ভুল-এর দ্বন্দ্ব একবারও নজরে এল না। কোনও কথা কাটাকাটি নয়, উচ্চ স্বরে কথাও নয়। শান্ত চেহারা, প্রশান্তিতে ভরা। না, কারো সঙ্গে তুলনা করা বোধহয় ঠিক হবে না। মাত্র কয়েক ঘন্টার আলাপ, কিন্তু খুব কাছের মানুষ মনে হচ্ছে। খুব সহজে আমাকে আপন করে নিয়েছেন। কথা বলতে বলতে প্রায় তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেল। বুঝলাম এখন সন্ধ্যা আহ্নিক করার সময়। হাত পা ধুয়ে এসে দুজনে ধ্যানে বসলেন। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছি ওঁদের। রাত তখন ন'টা। আহ্নিকের পর ওঁরা রাতের আহার করতে বসলেন। আমারও ডিমের ডালনা আর ভাত এসে গিয়েছিল। খাবার পর সঙ্গে আনা বলরামের কড়াপাকের সন্দেশ দিলাম ওঁদের। আপত্তি করলেন না। তারপর আবার কিছু সাংসারিক কথা – দিদিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার স্ত্রী এবং মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। খানিক পরে বুঝলাম ওঁদের ঘুমোতে যাবার সময় হয়েছে। একটা চাদর আর বই নিয়ে 'গুডনাইট' বলে ওপরের বাঙ্কে উঠে গেলাম। বই পড়া আর হয়নি, ওঁদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল ছ'টার সময়। ট্রেন থেমেছে মানমাদ ষ্টেশনে। উপরে অপর দিকের বার্থে দেখলাম একজন শুয়ে আছেন। অনেক রাত্রে নাগপুরে উঠেছেন হয়তো। নীচে তাকিয়ে দেখি, সেই অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য। দাদা-দিদি দুজনেই ধ্যানে মগ্ন। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে বসেছেন। খুব ভাল লাগছিল দেখতে। অপেক্ষা করে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে দিদি তাকালেন এবং ইশারা করে নীচে নামতে বললেন। হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলাম।

- "ঘুম হয়েছে, নাকি বউয়ের কথা ভাবছিলে?" ঠাট্টা করে বললেন দিদি।

সাহস করে বলতে পারলাম না যে ওঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে শুধু ওঁদের কথাই ভাবছি। চা ও বিস্কুট এগিয়ে দিলেন দিদি। চা খেতে খেতে আবার গল্প শুরু হ'ল। আজকের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা – ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, কর্মযোগ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি। বেশ গুরুগম্ভীর আলোচনা।। আমার বক্তব্য রাখলাম, ভগবান মানি কিন্তু মূর্তি পুজোয় বিশ্বাস করি না। আত্মা নিয়ে অনেক চর্চা হ'ল, শেষপর্যন্ত দিদির বক্তব্যই মেনে নিলাম, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। প্রায় ন'টা বাজে। প্রাতরাশের সময়। আমার টোস্ট অমলেট এসে গেছে। ওঁরাও চিঁড়ের পোলাও বার করলেন, সঙ্গে আরও কিছু টুকটাক।

যে সময়ের মানুষ এঁরা, সে যুগে মেয়েদের বিবাহপূর্ব পদবী রেখে দেওয়ার বা ব্যবহার করার চল ছিল না। মেয়েরা তাদের স্বামীর পদবীটাই ব্যবহার করত। কাজেই যখন বাইরে ঝোলানো চার্টে দেখলাম এঁদের দুজনের পদবী আলাদা, স্বাভাবিকভাবেই মনে একটা খটকা লাগল।

সারা সকাল এই ব্যাপারটা নিয়ে মন খচখচ করছিল। ভাবতে ভাবতে ট্রেনটা দাউন্দ জংশনে ঢুকল। লম্বা স্টপেজ। তারপর পুনে জংশন ঠিক এক ঘন্টার পথ।

শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে দিদিকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, "আচ্ছা, আপনি আপনার স্বামীর পদবী ব্যবহার করেন না কেন?"

ভদ্রমহিলা মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, "কেন? তাই তো করি।"

এবার আমার আরো অবাক হওয়ার পালা। উনি বললেন, "তুমি কী ভাবছ জানি না, আমরা আসলে বিবাহিত নয়।"

কথাটা শুনে আমার মুখের চেহারা বোধহয় একটু বদলে গিয়েছিল।

এবার ভদ্রলোক হাল ধরলেন, "তবে শোনো, আমরা পরস্পরের পরিবারকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। আমাদের ছেলে মেয়েরাও একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার স্ত্রী গত হয়েছেন দশ বছর আগে। ক্যান্সার হয়েছিল। এঁর স্বামী গত হয়েছেন বারো বছর আগে, হার্ট অ্যাট্যাকে। আমরা দুজনে এখন পরস্পরের অবলম্বন। একাকীত্ব থেকে বাঁচার উপায়। মানসিক সাপোর্ট। একসঙ্গেই থাকি। ঘুরি ফিরি। পরস্পরের দেখাশুনা করি। ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়ে বিয়ে থা করে সংসার করছে। তারাও খুব খুশি, কারণ তাদের ঘাড়ে চাপিনি। কিন্তু বিয়ে বলতে যেটা বোঝায় সে অনুষ্ঠান আমাদের কখনোই হয়নি। কি, বুঝতে পারলে?"

আমি মাথা নাড়লাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ট্রেন লোনি পেরোচ্ছে। এর পর হডপসার। কেন জানি না মনটা খুব হালকা লাগছিল।

ট্রেন পুনে জংশনের এক নং প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। ট্রেন থামতে দেখলাম সামনে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন দুই পক্ষের। ঝটপট নিজেরাই সব মালপত্র বার করে নিল।

দাদা-দিদি আমার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিলেন। নমস্কার বিনিময় হ'ল। ওরা দুজনেই ভাল চাকরি করে। ওদের সঙ্গেও কথা বলে খুবই ভাল লাগল।

সবাইকে বিদায় জানিয়ে এবার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিলাম।

মনে শুধু গেঁথে রইল একটা সুন্দর সম্পর্কের রেশ।

স্বর্ণচাঁপা

বৈশাখী চক্রবর্তী

রাত সাড়ে আটটা। কালো রঙের সেডান গাড়িটা এসে থামল মুর্শিদাবাদে ডোমকলের পুরনো জমিদার বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে এল অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক। বয়স বছর বত্রিশ। রাজ - রাজশেখর চৌধুরী। ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। গৌর বর্ণ। চোখ মুখে আর্যদের ছাপ। কালো রঙের টিশার্ট আর বেইজ রঙের চিনোস পরনে। বাঁহাতের কব্জিতে রোলেক্সের ঘড়ি। ডানহাতে ধরা আইফোন।

কলকাতা থেকে পড়াশোনা শেষ করে বিদেশে গিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট পড়তে। পরে নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক একটি ব্যাঙ্কে উচ্চপদে আসীন হয়ে সেটল করে। ভারতে শেষ এসেছিল পাঁচ বছর আগে।

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে এসেছে লম্বা ড্রাইভ করে। কলকাতা থেকে বাবা, মা ও অন্যান্য আত্মীয়রা আসবে দিন সাতেক পরে। তার বিয়ের ফাইনাল কেনাকাটা চলছে কলকাতায়। মেয়ে পছন্দ করেছেন মা। রাজ ছবি দেখেছে। অপূর্ব সুন্দরী। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে কমপ্যারাটিভ লিটারেচারে এম এ করেছে। ওড়িশি নাচের নিয়মিত স্টেজ পারফর্মার। বেশ কয়েকবার ভিডিও কলে তার সঙ্গে কথাও হয়েছে। তবে মুখোমুখি দেখা হবে একদম ছাদনাতলায়।

দাদুর আমলের লোক গণেশকাকা বাড়ির ভেতর থেকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এল। বয়স হয়েছে। চোখে ছানি। লোল চর্ম। কিন্তু আন্তরিকতা অটুট। স্কাইব্যাগদুটো রাজের হাত থেকে নিয়ে এবং রাজকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে গেল। বাড়িটা সম্প্রতি সারাই করা হয়েছে। জমিদার বাড়ি, এ মহল থেকে ও মহল দেখা যায় না। সব ঠিকঠাক করতে প্রচুর খরচা। কিন্তু বাবা মায়ের ইচ্ছে বনেদীয়ানার পরিচয় রেখে বিয়ে হবে এখান থেকেই।

রাজকে গণেশকাকা নিয়ে গেল একটা ঘরে, ছোটবেলা থেকেই যে ঘরটাতে সে এসে থাকত। গণেশকাকার নাতি, গোপাল রাজের পিছনে পিছনে চলতে থাকল। ঘরের দরজা খুলে দিয়ে কাকা রাজকে চান করে নিতে বলে, নিজে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে গেল। রাজ ধীরে ধীরে ঘরে

ঢোকে। খুব চেনা একটা গন্ধ তার নাকে এসে লাগে । মেহগনি কাঠের আসবাব, সাদা নরম বিছানা দেখে হঠাৎ খুব ক্লান্তি অনুভব করে সে । ঘরের সাথে লাগোয়া বাথরুমে নিজের জামাকাপড় নিয়ে স্নানে যায়। বাথরুমটা বছর দশেক আগে তার বাবা পুরোপুরি ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে তৈরী করান। অনেকক্ষণ ধরে চান করে ক্লান্তি দূর হয়। ঘরে এসে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই আবার সেই চেনা গন্ধ! ড্রেসিংটেবিলের ওপর রূপোর কারুকার্য করা জলভরা একটি রেকাবিতে ভাসছে একমুঠো সতেজ স্বর্ণচাঁপা। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। কোথা থেকে এল ফুলগুলো? আগে তো ছিল না! এই ফুলের গন্ধ হঠাৎ টেনে সরিয়ে দেয় অতীতের পর্দা।

দশ বছর আগে – তখন সদ্য গ্রাজুয়েট হয়ে ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে । বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা চলছে। মোটামুটি কয়েক জায়গা থেকে উত্তরও এসেছে । বিদেশে যাওয়ার আগে একবার দেশের পুরনো বাড়িতে ঘুরতে যাওয়া। শরীর একটু খারাপ হওয়ায় মা সেবার যেতে পারেননি। দিদিও থেকে যায় মা'র পরিচর্যা করার জন্য। বাবার সাথে সে আসে দেশের বাড়িতে বেড়াতে।

বসন্ত যাই যাই করছে। গ্রীষ্মের হালকা আমেজ। ছোট থেকে এখানে অনেকবার এসেছে সে সবার সাথে। কিন্তু এবার সঙ্গী কম। বাবা এসেই গণেশকাকাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন জমি-জমার কাজে। রাজ একা।

সেদিন বিকেল শেষে সবে গোধূলি ছড়িয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে ছাদে উঠে আসে। পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে ও কে? সুহানী না? গত তিন বছরে কত বড় হয়ে গেছে সুহানী! কাছেই থাকে। ভীল জাতির মেয়ে। গায়ের রঙ কালো হলেও মুখখানি অদ্ভুত মিষ্টি, হাসিটাও। ওকে দেখে সে এগিয়ে যায়। ছোট থেকে তাকে দেখেছে। ওর খুব কাছে এসে হঠাৎ মনে হ'ল এ সেই ছোট্টবেলার খেলার সাথী নয়। অন্য এক নারী। তার উদ্ভিন্ন যৌবন কাঁচুলি আর শাড়িতে বাঁধা যাচ্ছে না।

- "কিগো রাজাবাবু, কেমন আছ?"

রাজ বলে, "সুহানী, তুই কত বড় হয়ে গেছিস!"

একগাল হেসে সে বলে, "তুমিও তো মনিষ্যি হয়ে গেছ বটে।"

সুহানীর খোঁপা থেকে স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ আসে। ধীরে ধীরে রাজ ছোটবেলার খেলার সাথীর প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ বোধ করে।

হাসি গল্পে ক'দিন কাটে। এর মধ্যে একদিন বিকেলে রাজ স্বর্ণচাঁপা তুলে নিয়ে এসে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সুহানীর খোঁপা সাজিয়ে দেয়। সুহানী তার বুকে মাথা রাখে। দু'হাত দিয়ে ওর মুখ আলতো করে তুলে ধরে দীর্ঘ এক চুম্বন এঁকে দেয় সুহানীর চাঁপার কলির মতো ঠোঁটে। সুহানীর উদ্দাম শারীরিক স্রোতে ভেসে যায় রাজ। খুনসুটি আর আদরে কেটে যায় ঐ ক'দিন। তারপর ফেরার পালা। ফেরার দিন আবার স্বর্ণচাঁপা গাছ থেকে ফুল তুলে এনে, আর একটি মুক্তোর আংটি পরিয়ে আদরে আদরে অস্থির করে তোলে সে সুহানীকে।

ছলছল চোখে সুহানী বলে, "আবার আসিবেক তো? ভুলিবেক নাই?"

সুহানীর ঠোঁটে চুমু দিয়ে রাজ বলে, "তোকে ভুলব কী করে পাগলি!"

ফিরে যায় রাজ। জীবন ভীষণ ব্যস্ত। বিদেশে পড়াশোনা, চাকরি সামলে দশ বছরে আর আসার সুযোগ হয়নি।

- "খেতে এসো রাজাবাবু।" গণেশকাকার আওয়াজে সম্বিত ফিরে আসে।

জিজ্ঞেস করে, "কাকা, ঐ ফুল কি তুমি রেখেছ?"

- "না তো, হয়তো গোপালের কাজ।"

একটু আনমনা হয়ে খেতে যায় সে। গোপাল তার পাশে বসে। অদ্ভুত সুন্দর রান্নার হাত কাকীমার। বহুদিন পর বাঙালি খাবার – লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা, খাসির মাংস আর পায়েস খেতে খেতে গোপালকে জিজ্ঞেস করে ফুলের কথাটা। সে কিছুই বলতে পারে না।

খাওয়া শেষে ঘরে এসে সংলগ্ন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সামনে বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করে। আকাশে একাদশীর একফালি চাঁদ। আবার বাতাসে ভেসে আসে সেই সুগন্ধ। মা ফোন করলে কথা বলার ফাঁকে দেখে গণেশকাকা খাবার জল বিছানার পাশের টেবিলে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

এতটা জার্নির পর চান ও খাওয়া সেরে খুব ক্লান্ত লাগে। ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে হালকা নীল আলো জ্বালিয়ে জানলা খোলা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ে রাজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ গভীর ঘুমের মধ্যে

অনুভব করে একটা ঠান্ডা হাতের স্পর্শ| হাতটা মাথা থেকে তার মুখ, গলা, হাত ও বুক স্পর্শ করছে | সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে | চোখ খুলে দেখে কেউ নেই | শুধু সেই গন্ধ | শরীরটা পাথর হয়ে গেছে | পাশে রাখা সেলফোনে দেখে রাত দুটো চল্লিশ | অতি কষ্টে উঠে বসে জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে | আধঘন্টা পরে আবার চোখ লেগে যায় | আচমকা কানের কাছে শোনে ফিসফিস আওয়াজ, "রাজাবাবু, এই রাজাবাবু, তু কেমন লোক বটে? আমারে ভুলিস কেমনে?"

সাঙ্ঘাতিক চমকে ঘুম ভেঙে যায় | সুহানীর গলার আওয়াজ | ঘামে ভিজে গেছে পুরো শরীর | রাত তিনটে পঁয়ত্রিশ | বাকি রাত না ঘুমিয়েই কেটে যায় |

পরদিন সকালে গণেশকাকাকে জিজ্ঞেস করে সুহানীর কথা | কাকা চুপ করে থাকে | গোপাল হঠাৎ বলে ওঠে, "দাদু, সেই ভীল মেয়ে, যে আত্মহত্যা করেছিল?" চমকে উঠে রাজ! কাকা ধমকে গোপালকে চুপ করায় |

সে রাতে আবার ঘুম ভাঙে কানের কাছে হিসহিসানি শব্দে, "রাজাবাবু, এ রাজাবাবু ভালবাসিবিক নাই? তবে আমাকে মুক্তি দিস না কেনে?" জেগে কাটে সে রাতও |

পরদিন চেপে ধরে কাকাকে | অনেক প্রশ্নের পর কাকা মুখ খোলে – যে বছর পরীক্ষার পর রাজ এসেছিল, সেবার সে চলে যাবার পর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় সুহানী | গাঁয়ের মোড়ল অনেক প্রশ্ন করলেও সে মুখ খোলে না; শুধু বলে, "সে আমার ভালবাসার মানুষ |" তার দুদিন পর সুহানী আত্মহত্যা করে সামনের নিমগাছে ঝুলে | ঐ গাছের নীচেই তার দেহ পুঁতে রাখা হয় |

আর শুনতে পারে না রাজ | ঘরে ফিরে গিয়ে দেখে আয়নার সামনে আবার সতেজ স্বর্ণচাঁপা রাখা |

মা ফোন করে বলে পরের দিন সকালে আসছে সবাই | মাঝরাতে টর্চ আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে যায় রাজ | চলে নিমগাছের দিকে | সেই চেনা গন্ধ তার সাথে চলে | নিমগাছের গোড়ায় দাঁড়াতেই কে যেন বলে, "এসেছ রাজাবাবু? মুক্তি দাও আমায় |" দু'ঘন্টা ধরে পাগলের মতো রাজ মাটি খুঁড়তে থাকে | তারপর পায় একটি কঙ্কাল, যার হাতে রাজের দেওয়া সেই মুক্তোর আংটি | আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে সে | সুহানী নিজেকে বলিদান দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে গেছে | কারণ ভীল প্রজাতির নিয়ম খুব কঠিন | বলাৎকারকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয় তারা | অনেক প্রশ্নের পরও সুহানী মুখ খোলেনি | বলেনি তার ভালবাসার নাম |

সুহানীর দেহাবশেষের অন্তিম সংস্কার করে যখন সে বাড়ির রাস্তা ধরে তখন দূর থেকে সানাই-এর শব্দ শোনা যায় | স্বর্ণচাঁপা গাছের নিচে যেতে একটি ফুল তার মাথায় ঝরে পড়ে | সুহানীর আত্মার শান্তি অনুভব করে রাজ |

মনসঙ্গীত

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

যে জানে তার সকল কিছু
ভবিষ্যতের কর্ম,
সেই লবে তার সবটুকু ভার
মন চালনার ধর্ম।

আমরা তবে সকল সময়
কেন করি চিন্তা,
মিছে মিছে খারাপ ভেবে
কাটাই সারা দিনটা?
যা ভাল তার তা হোক তবে
থাক আশিসের বর্ম।
সেই লবে তার সবটুকু ভার
মন চালনার ধর্ম।

সময় যখন হবে তখন
জানবে কোনটা ঠিক ভুল,
ঠিক নিশানায় তরীটি তার
পৌঁছে পাবে জয়কূল।

আনন্দ তার জীবন জুড়ে
আসুক ছন্দে ছন্দে,
দুঃখ যা সব যাবে সরে
মিশবে ভালয় মন্দে।
তাঁর সৃষ্টির শঙ্খ বাজুক,
ভরিয়ে জীবন বর্ম।
সেই লবে তার সবটুকু ভার
মন চালনার ধর্ম।

ঋতুরাজ বসন্ত

কমলপ্রিয়া রায়

প্রতিবার বসন্ত আসে
চলে যায় প্রতিবার
ফাগুন আগুন রঙে মাতিয়ে
স্মৃতিটুকু রাখে সে ধুলায় –
হে বসন্ত হে ঋতুরাজ
তুমি এসো মোর মনোমাঝে
দাও রাঙিয়ে তব উজল রঙে
অপরূপা করো তব সাজে
এ নহে বাহিরের সাজ
অন্তরের অন্তঃস্থল হোক রাঙা
সে রঙ ছড়িয়ে বিশ্ব উঠুক রেঙে
ঘুচে যাক চোরা ভাঙা যত কষ্ট
যত দুঃখ কালিমা –
তোমার উজ্জ্বল পরশে পাক মধুরিমা
সব যুদ্ধ সব ক্ষত যাক দূরে সরে
নব-জাগরিত হোক বিশ্ব তোমার আবির্ভাবের সুরে
যে আছে অনেক নীচে অভুক্ত ক্লান্তি রাশি রাশি
তার হাতে তুলে দিও তোমার নব জীবনের বাঁশি
বাঁশির সুরে গেয়ে উজ্জীবনের গান
হে বসন্ত আজ তুমি
সকলেরে করো আহ্বান।

স্বাধীন দেশে যুদ্ধ এল

রঙ্গনাথ

স্বাধীন দেশে যুদ্ধ এল – এ এক খামখেয়ালি খেলা
খেলতে গিয়ে দেশ দখল, এই তার ফয়সালা!
মাতাল নেতা দেয় আদেশ, "সবাই করো আত্মসমর্পণ"
ছড়ায় আতঙ্ক চতুর্দিকে, দেয় ধমক, হুঙ্কার-গর্জন।
নেতার কথা, "কেহ যদি বাধা দেয়, হবে তার মরণ"।

গুলি চলে, কামান চলে; এলোপাথাড়ি বোমা পড়ে
অফিস, হাসপাতাল, দোকান, স্কুল-কলেজ, বাড়িঘরে –
সুন্দর যা ছিল হচ্ছে ধ্বংস, শহর আর যায় না চেনা;
উড়ছে ধোঁয়া আকাশ পানে, অগ্নিকান্ড আর থামে না।
নেতা বলে, "হয়নি কারো ক্ষতি, সব মিথ্যা রটনা"।

সৈন্য, পুলিশ, জনতা মরে, শিশুরা মরে জ্বলে-পুড়ে;
বাড়ে কান্না, আহাজারী, যখন বোমা পড়ে ঘুরে ঘুরে।
দখল হচ্ছে স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে ধ্বংস
হাজার হাজার প্রাণ হারাচ্ছে, কেহ বা হচ্ছে নির্বংশ।
নেতা হাঁকে, "দেশটি চাই, এ হবে সাম্রাজ্যের অংশ"!

অভাগা দেশ ছিন্নভিন্ন, মুছে যাচ্ছে ঐতিহ্য-ইতিহাস
দেশ ছাড়ছে বৃদ্ধ-মহিলা-শিশু, দেশান্তরে শান্তি-বাস।
নির্ভীক নাগরিক যুদ্ধ করছে যাতে দেশ রক্ষা পায়
লড়ছে তারা সারা দেশে, স্বাধীনতাকে বাঁচাতে চায়।
নেতা ক্ষিপ্ত, "বেশী লড়লে শেষ হবে মাশরুম বোমায়"।

বড় মাছ গিলবে ছোট মাছ, এটাই তো হয় সব সময়
মস্ত দেশ পুঁচকে দেশকে গ্রাস করতে পারে নিশ্চয়!
সভ্যতার উপর কালোছায়া, কেউ পারছে না ঠেকাতে
গণতন্ত্র, স্বাধীনতা অপদস্থ, কট্টর স্বৈরতন্ত্রের হাতে।
নেতা উত্যক্ত, "ধিক্কার পাই, তোয়াক্কা নেই তাতে"।

সবাই দেখছি এক ধ্বংসযজ্ঞ, সবাই শুনছি আর্তনাদ
অশ্রু আনে এ নারকীয় দৃশ্য – যা ঘটাচ্ছে এক উন্মাদ।
বীর যোদ্ধারা ঝুঁকি নিয়ে বর্বরদের সাথে করছে লড়াই
শীঘ্র তাদের জয় হোক, সবাই আমরা এই তো চাই!
নেতার দম্ভ, "আমাকে হারাবে, বিশ্বে এমন কেহ নাই"।

দু'দেশে যুদ্ধ - একটি ধ্বংস, গণহত্যা করে শক্তি দেখায়;
আক্রান্ত দেশটির জনগণ যুদ্ধ করে স্বাধীন থাকতে চায়।
যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা – হার-জিত হবে, সেটা বড় কথা নয় –
বড় প্রশ্ন, এত বোমাবাজি ও নৃশংসতা কেন সম্ভব হয়?
অহেতুক হিংসা-ধ্বংস-মৃত্যু, নয় কি মানবতার অবক্ষয়?

শব্দের মেহেক

কৃষ্ণা গুহ রায়

রোজই সকালে জানতে চাও পড়েছি কিনা,
একটু একটু করে পড়ছি শুনে,
অপেক্ষায় থাকো।
বিনয়ের স্বরে ঝরে পড়ে পাঠ প্রতিক্রিয়া,
বেশ জানো স্তুতিবাক্য আমার জন্য নয়,
নির্দ্বিধায় বলে যাই কিছু ভাল লাগার পঙক্তি।
কখনও এক চুমুকে শেষ করা যায় না কবিতার পেয়ালা,
জুড়িয়ে জুড়িয়ে চুমুকে চুমুকে উপভোগ করি কাব্য বিলাসিতা,
আদুরে সকালে ভেসে আসে কুমকুমে রাঙানো শব্দের
মেহেক।

ভিখারী সন্ন্যাসীর আত্মকথা

গৌতম তালুকদার

ঐশ্বর্য,
হৃদয় ঐশ্বর্য তুমি
তোমারে ভালবাসি
বিশ্বের সকল সম্পদ দিয়ে
জেনো তুমি –
ভালবাসিনি
এ কথা সত্য নয়
যদিও আমার জীর্ণ বেশ
ভিক্ষা আমার ব্রত।
মিনার সমান তোমার স্তনের অনন্ত সৌন্দর্য
আমার অন্তর আত্মার দাহ
আমার একলা আমির কান্না
তুমি আমার দেব পিপাসার উত্থান।
কঠিন সংকোচের পরাকাঠে বদ্ধ আমার আত্মা, নিস্তব্ধ সে
যার গভীরে লুকিয়ে আছে প্রভুর অনুরাগ আর ভালবাসা।
তোমার কপোল হীরক কর্ণকুণ্ডলের শোভায় শোভিত
সে সৌরভ, অনন্তের বাণী, প্রভুর ক্রন্দন, তুমি প্রভুর কান্না।

গৃহীর সম্পদহারা আমি
সংসার আবেশমুক্ত
আমার বেশ তারই পরিচয়।
তোমার আত্মার নগ্নতা
তোমার সরল সরলতা
তোমার হাসি
তোমার উচ্ছ্বাস
তোমার বাহুর বন্ধন
তোমার চুম্বন
তোমার প্রেমের লীলা
তোমার সরল সরলতা
তোমার বিশেষত্ব।
নারীকে জানার অবকাশ পাইনি
পুরুষ আমি
পুরুষের মাঝে আর
প্রভুর উপাসনায়
কেটেছে দিন
সংসার সত্য পরিচয়শূন্য
তোমার ভিক্ষার পাত্র
সে তো
প্রভুর আশ্রমের প্রবেশ দ্বার।

আজীবন একুশে

আলী তারেক

"তুমার বয়স কত?"
এক বছরের উদোম গায়ের ভাইটি কাঁখে
পাঁচ বছরের ফুলি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসে হঠাৎ।
ঢাকের মতো পেট নিয়ে ভাইটি তার ডান হাতের শক্ত থাবায় বোনের কাঁধ আঁকড়ে –
যেন সারাদিনের বরাদ্দ দেওয়া এক টুকরো রুটি,
জীবন গেলেও ছেড়ে দেবে না কিছুতেই।
কিংবা ফুলির কাঁধই যেন তার জীবন।
আর বাঁ হাত বোনের বুকের কাছে নিশ্চিন্ত জমা রেখে
নাকে ঝরা সিকনি ঠোঁট দিয়ে চেটে চলেছে নির্বিকার।
ফুলির প্রশ্নবোধক ঠোঁটের নীচে ছোট ছোট দাঁত ঝিকঝিক করে।
আমি সেইদিকে তাকিয়ে তার প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে বিহ্বল।
এরই মাঝে আরেকটি প্রাণের দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া পাঁচ বছরের ফুলি
ঠিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলে না।
যেন আমার বিভ্রান্তির সাহায্যে আসার জন্য ভাইকে ধরে রাখা
হাতদুটির একটি ছাড়িয়ে নিয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখায়,
"আমার দাদী। মেলা বয়স! আমগোর গেরামের সবথিকা বুড়ি!"
গালের চামড়া ঝুলে আসা কয়েক ডজন ভাঁজ আর
হলদে হয়ে আসা সাদা শাড়িতে অল্পই ঢাকা
খরার জমির ফাটলের মতো ফাটাফাটা চকচকে গায়ে বসে
বয়সের চেয়ে বয়স্ক এক নির্বাকতার প্রতিমূর্তি।
"তুমার বয়স আমার দাদীর থিকা বেশী?"
ফুলির কণ্ঠে বিস্ময় আমার কণ্ঠরোধ করে রাখে।
যে ভাবনাগুলো সে রুদ্ধপথে রুদ্ধ হয়ে থাকে,
তার গল্পের ক্রম ওই সিকনিচাটা ভাইয়ের আধো আধো বুলি
হতে শুরু করে, ফুলির ফুল আঁকা ফ্রকের মতো
অন্তহীন নিষ্পাপ প্রশ্নগুলোর পথ ধরে
বয়সের চেয়ে বয়স্ক দাদীর দাঁতহীন মাড়ির
অস্ফুট বিড়বিড়ে ফিরে যাওয়ার উপাখ্যান।
ভেবে পেলাম, ফুটফুটে মেয়ে ফুলির কথায়
তারই অবাক প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিন্ত নিহিত।

"তুমার বয়স কত?" ফুলির প্রশ্ন তার ভাইয়ের নাকের সিকনির মতো
ঝুলে থাকে নিরন্তর সময়ের পটভূমিতে।
"আমার বয়স কত?" ফিরে নিজেকে জিজ্ঞেস করি আমি।
ইতিহাস, আর ইতিহাসের আগে গুহাচিত্রের রং যখন
ধীরে ধীরে অনূদিত হ'ল মুখনিঃসৃত শব্দমালার ধ্বনিতে,
আমার অস্তিত্বের ইতিহাস পঙক্তিবদ্ধ সেই পুরাকালের উপক্রান্তে।
তবু আমার অস্তিত্বের দীর্ঘ এই ইতিহাস সত্ত্বেও
আমার বয়সের দৌড় কি বার্ধক্যের জরাবস্থা পার হবার সামর্থ রাখে?
রাখে না।
তাই ফুলির প্রশ্নে, অন্য সব প্রশ্নের মতোই, তার উত্তর অন্তর্নিহিত ছিল।
ফুলির দাদী যখন গালের ভাঁজে ভাঁজে তার শব্দগুলো একে একে হারিয়ে ফেলল,
তার পরে আমার বয়স এগোবার আর কোনো জায়গা নেই।
যতদিন কোনো মুখে একটিও শব্দের বসবাস, ততদিন আমার অনিঃশেষ যৌবন।
তাই ফুলির মুক্তোর মতো হাসি দিয়ে বাঁধানো দাঁতের অবাক প্রশ্নের উত্তরে
আমি আমার নির্বাক ভাষায় শুধু বলে উঠতে পারি,
"বাহান্ন থেকে দু'হাজার বাইশ, সত্তরের স্তব্ধ বিস্ময়ে, আমি রয়ে গেছি আজীবন একুশে।"

নারী দিবস

শঙ্কর তালুকদার

রাত্রি শেষে
দিন আসে
দিনের শেষে রাত্রিবাস
নারী দিবস উদযাপনে
ধ্বংস হোক সব সন্ত্রাস।

যে নারী জন্মদাতা
যে নারী ভগিনী-ত্রাতা
আমার এই ধরিত্রী
তোমার স্নেহে ভুবন মাখা
ভুবনময়ী শ্রী তুমি।

তুমি প্রেয়সী আমার
তুমিই বন্ধন
হে নারী প্রণমি তোমায়
তোমার জাগরণে
মোর জাগরণ।

তোমারে অসম্মান করে
আপন অহংবলে
বিবস্ত্র করে যে প্রাণ
হোক ধ্বংস, হোক লীন
পাও ফিরে মান।

অবলা নারী যে বলে
তাহারে ভ্রূকুটি ছলে
রক্তচক্ষু হানি
শুদ্ধ হোক এই সংসার
দেখাও তোমার শক্তিখানি।

দাসীরূপে সেবা তব
দাসী তুমি নও,
নয়নের মণিসম
চিরন্তন সমাজে
তুমি বিকশিত হও।

অনুরণন

সফিক আহমেদ

আর প্রতিফলন নয়
চাই জীবনের অনুরণন।

হতাশা, ঈর্ষা, কেড়ে নেয়
প্রেম প্রশ্রয় ভালবাসা,
পলেস্তারা খসে পড়ে
মেকি প্রলেপের আস্তরণের।

কত শত চেনা মুখ
বদলেছে সময়ের আঁচড়ে,
নরম সম্পর্কের পলিমাটি
আজ খরায় চৌচির।

আরশিতে জমা ধুলো মুছে দেখি
ভাঙা ভাঙা আবছায়া অবয়ব,
পারদ ওঠা আয়নায় অচেনা আমি
যাকে আমি একদমই চিনি না।

আজকাল আমি আর আরশি দেখি না
চোখ মেলে দেখি শুধু জীবনকে

জীবনের পদে পদে
আবার ফিরে পাই
সান্নিধ্যের পেলবতা
স্পর্শের মাদকতা
দৃষ্টির মদিরতা,
আলিঙ্গনে আদিমতা

আজকাল আমি আর আরশি দেখি না
শুধু জীবনের ক্যানভাসে
নতুন নতুন ছবি আঁকি।

রূপসী সেই মেয়ে

আনন্দময়ী মজুমদার

রূপসী সেই মেয়ে
যেন মাটির প্রদীপ
রোশনাই
রোশনাই হয়ে আছে বিশেষ আঁধারে
মেকআপে কখনো দেখি নাই তারে।

আঁখিপল্লব গাঢ়
প্রথম বয়স থেকে
খোলা জানালার মতো প্রেম তার
ছলছল করে রোদের নির্যাসে

রূপসী সেই মেয়ে
মরূদ্যান দেখি
খুশির লহমা ছড়ায়
শিশু সে তার সরল প্রতিভায়।

বাঘিনী সে
চাষ করে সোনা
ছাড়ে না আবাদ।

সেই মেয়ে
হুঁশ জ্বেলে রাখে
সাহসে পানপাত্র ভরে

এলোমেলো হোক খাতাপাতা
খেইহারা
হয় না কখনো

নীল স্বচ্ছতা
ঝুঁকে সে আমাদের
স্বপন, উত্থান, রণনের মাঝে

সেই মেয়ে
হয়তো তারে দেখি নাই,
দেখিতে না চেয়ে।

রূপসী বাংলার সৌগন্ধে ভরা এইখানে
ক্ষয় আর ক্ষতির ভিতর
তার চলন-বলন
জনমে জনম জুড়ে গেলে।

যুদ্ধের দ্রিমদ্রিমে
তার স্বর ভাসে
সুধাকণ্ঠ হয়ে
আকাশে আকাশে।

আমাদের সব আলো
তারে দেখে মাটির মধু হতে চায়
স্থির করে, কেন্দ্রীভূত
শান্ত হয়ে আসে।

জলের শব্দ

পিয়াংকী মুখার্জী

চারটে মানুষ তিনটে গাছ দুটো পাখি।
একটা রাস্তা...

গন্তব্যে পৌঁছাল যারা, তাদের গায়ে আরোগ্য। তাদের পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে সূর্য
নদীর ধারে এসে ডুবে যাচ্ছে জল
তীব্র গোঙানি, গভীর অসুখ, শব্দের ঘোর... ছলাৎ ছলাৎ

কৃষ্ণ-রাধা বা দ্বৈপায়ন আচার্য, ভ্যান গঘ হোন অথবা ঋতুপর্ণ – মৃণাল
শূন্যঘোরে দাঁড়িয়েছ প্রত্যেকেই এক-একজন শূদ্র বঞ্চিত

কুলোয় শোক, অথচ জ্যোৎস্না এসে মিশলে ফতুর হয়ে যায় এই ধুলোবালি মানুষ-জন্ম

একটা সরু গলি দু'চারটে শামুক
পরের স্টেশন, অপেক্ষায় যাত্রী...

ঘুমজাগানি

দীপান্বিতা সরকার

খুকু রাঁধলে, খোকা জুড়াল...
খবর এল দেশে,
মেয়েরা যদি আপিস করে,
ভাত বাড়বে কি সে?

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী
তুমিও ঘুমাও না...
জেগে উঠলেই বিপদ ভারি।
এটাও বোঝো না!

ছেলে কোলে, গরম উনুন
সামনে খোলা বই...
স্কুলের পড়া শেষ করে সে
মুখে কথার খই!

গতর বাড়ে,খাটনি ভারি
লোকের বাড়ির কাজ
ঘোমটা ঢেকেই, কাপড় ধুবি
রাখবি নিজের লাজ।

রাতের টেরেন,আঁধার গলি
নিষেধ মানিস না...
তাই তো লোকে খুবলে খেল,
এটাও জানিস না।

পায়ে তোমার নূপুরজোড়া
শিকল বাঁধা প্রাণ...
কলম ধরো, লাঠিও ধরো
বাঁচাও নিজের জান।

বেশ করেছিস, পিরিত করে
জাত রাখ চুল্লিতে!
আসল জাতের বালাই
হারায়, নিষিদ্ধ পল্লীতে।

ঐ ছুঁড়িটা, কুস্তি লড়ে
পাড়ার সে মস্তান...
শুনছি তাঁকে মান্য করে
শ্মশান-গেরস্থান।

সাহসী মেয়ের বুকের পাটা
আর মায়ের বুকের দুধ,
হাত রেখে দেখ, এই বেলাতে
জীবনভরের সুদ।

চু কিৎ কিৎ, ছোট্টবেলা,
নরম মাটির তাল...
এই বেলা নে, নামতা পড়ে
গাঢ় গুড়ের জাল।

সই-সাবুদ আর পাটিগণিত
শিখতে হবে সই।
মোটা চালের সাথে খাবি
শাক-সবজি, কৈ!

মনের সাথে,শরীরের খোঁজ
রাখিস মেয়ের মা।
নিজের জন্যে, নিজের লড়াই
থামলে চলবে না।

এই দুনিয়ায় নারী দিবস বলে কিস্যু আছে?
সবটা শুধু ,মন ভোলানো
দেখনদারির মাঝে!

এই ছেলেটা, এই মেয়েটা
করিস নে আর তোরা।
শরীর হয়ে থাকিস না আর
মানুষ হয়ে দাঁড়া!
একবার মানুষ হয়ে দাঁড়া।

খুচরো

সৌমি জানা

খুচরো আছে?
নাকে মুখে গিলে ছুটবে
পাদানিতে ঝুলবে
খন্দ-খানায় নাচবে
তবে না হবে
দাদা, খুচরো আছে?

কালো কালো পিপীলিকা
পিঠে নিয়ে পেটের জ্বালা
রাতদিন ছুটে চলা
বুটের চাপে খানকয় ফাঁক
যে সে ফাঁক নয় জ্যাঠা
একেবারে চিচিংফাঁক

একবার ঢুকে গেলে
বেরোবে না ঠেলে ঠুলে
ভালবাসা আড়কাঠি
দিনকয় খেলাবাটি
ঢুকে গেলে সব ফাঁকি
পকেটে খুচরোটা থাক

না যদি জোটে কাজ
পার্টি ধরে গুলি গালাজ
নিশানায় মুমতাজ
চিতাজ্বলা শর্টকাট
সহজে কি পাবে ছাড়
খুচরোর সংসার

বুকে শুধু ওঠে ঝড়
বেলাদের বাসরঘর
তবু লেগে থাকো গুরু
এই তো সবে শুরু
হিসেবের কানাকড়ি
নেই কোনো ছাড়াছাড়ি

জীবনটা কালীদা
বাপি তুই বাড়ি যা
তলানিতে ফ্যানভাত
সাজিয়ে নে খালি পাত
আজ আছে কাল নাই
খুচরো কি হবে ভাই?

ঋণ

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

অপমান করেছ অনেক
হাঁসের পালক ভেজা বলে
অনায়াসে ঝরে গেছে জল
দুই চোখ এখনো তো ভারি

এসব ঘরের কথা প্রিয়
কতবার খুঁজেছি তোমাকে
বসন্তের উত্তরীয়খানি
শেষ পুঁজিটুকু দিয়ে কেনা

কত দূরে সরিয়েছ ঠেলে
ধীরে ধীরে সুকৌশলে জানো
আকাশের মেঘ আর পাখি
সব কিছু টের পেয়েছিল

ভালবাসা থেকে গেল ঋণ
কীভাবে মিটবে বলে দিও
আরো কিছু বাকি ভাবো যদি
আঘাতে হিঁচড়ে টেনে নিও

রবিবারের কাগজ

শঙ্কর তালুকদার

রবিবারের কাগজখানা
হৃষ্টপুষ্ট দেহে
পরিবেশন হচ্ছে দেখ
চায়ের টেবিলে।

কানাকানি যত আছে
ততই গুজব
রঙ চড়িয়ে সবেতেই
হচ্ছে মোচ্ছব।

ডুবতে গেলে কতটা জল
গিলতে হবে আগে,
হিসেবে করে সে ফর্দও
ছাপা আছে ধারে।

প্রাইমারি ইস্কুলের
হরিপদ মাস্টার
কাগজ বিছিয়ে ভাবে
কী হবে দেশটার!

সমাজ বিরোধীরা এখন
দলে বলে সাচ্চা
একক হলে সর্বনেশে
কাটা যাবে নামটা।

স্বদেশের নামেতে
মত্ত এখন সবে
ঘুঁটের গুণ গেয়ে
খেতাবের ঝড়ে।

রবিবারের কাগজখানা
বেশ ফুলেছে দেহে
ফুলছে যত গুজব তত
আসছে ধেয়ে ধেয়ে।

রাজার আবার গোঁসা হয়
দণ্ড দিচ্ছে তাই
ঘরে বাইরে বিভীষণ
এ বড় বালাই।

ঘরবন্দী মন

দীপশিখা চক্রবর্তী

ঘরবন্দী এক মন,
ছুটে যায় আশ্চর্য এক পৃথিবী ছুঁতে,
দু'চোখে মেখে নিতে চায়
এতদিনের ফেলে রাখা আকাশের উৎসব,
এখনই যে সময়,

দেখতে থাকে –
এক এক করে হাওয়ার সাথে মিশে যাওয়া আলো
মেঘের আপন খেয়ালে গেয়ে ওঠা গজল,
তালে তালে নেচে ওঠে, চিৎকার করে,
শান্তি!

মুঠো খুলে উড়িয়ে দেয় সবকটা ইচ্ছে,
হাঁফ ছেড়ে বাঁচে জীবন।

সবুজ ডিমের ডেভিল

বলাকা ঘোষাল

(এই কবিতাটি স্বনামধন্য ডক্টর স্যুসের ততোধিক জনপ্রিয় "গ্রীন এগ্‌স্ এন্ড হ্যাম্"-এর অনুবাদ করবার একটা অনধিকার চেষ্টা। বহু ত্রুটির জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। হাল না ছেড়ে যে শুভাকাঙ্ক্ষীরা যারপরনাই আশা নিয়ে লেগে থাকেন, একগুঁয়ে আর একঘেয়ে প্রতিবাদীদের বদলাতে, তাঁদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার এই নিবেদন।)

"এই যে এলাম, বিষ্ণু গোভিল, সাজিয়ে ফেলো টেবিল,
এনেছি এক আজব খাবার, সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"এ্যাঁ! সে আবার কী? ছ্যা ছ্যা ছ্যা, সবুজ ডিমের ডেভিল!
কক্ষনো না কক্ষনো না, ওহে বিষ্ণু গোভিল,
মোটেও মুখে রুচবে না ওই সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"কোথায় দেবো? হেথায়? হোথায়?"

"হেথায় হোথায় কোত্থাও নয়, শুনলে বিষ্ণু গোভিল?
মোটেও আমার পছন্দ নয়, সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"দেবো নাকি ফরাশ পেতে ইঁদুরছানার কাছে?
নাকি দেবো খোলা মাঠে খ্যাঁকশিয়ালের পাশে?"

"চাই না আমার এক্কেবারেই ইঁদুরছানার সাথে,
কিংবা খোলা মাঠের ধারে খ্যাঁকশিয়ালের পাশে,
হেথায়, হোথায়, কোত্থাও নয়, ওহে বিষ্ণু গোভিল,
মোটেও আমার পছন্দ নয়, সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"দেবো নাকি বাক্সে পুরে? বা প্রকান্ড এক থালা জুড়ে?"

"না হে!
চাই না কোনও বাক্সে পুরে, কিংবা বিশাল থালা জুড়ে,
কিংবা কোনও ফরাশ পেতে ছোট্ট ইঁদুরছানার সাথে,
অথবা এক খোলা মাঠে খ্যাঁকশিয়ালের পাশে বসে
হেথায় নয়, হোথায়ও নয়, এই দুনিয়ার কোত্থাও নয়,
কোনমতেই খাব না ওই সবুজ ডিমের ডেভিল।
যথেষ্ট বার বলছি তোমায়, শ্রীমান বিষ্ণু গোভিল,
চাই না, চাই না, চাই না আমি সবুজ ডিমের ডেভিল।
বেজায় মন্দ লাগে আমার সবুজ ডিমের ডেভিল,
ঢুকল কথা তোমার ঘটে, ওহে বিষ্ণু গোভিল?"

"কেমন হবে – এই ধরো না, গাড়ির ভিতর দিই যদি তা?
চেখেই নাহয় দেখলে এবার, মন্দ তো নয়, নতুন খাবার!"

"অসম্ভব! কিছুতেই নয়, গাড়ির ভিতর? কক্ষনো নয়।
কী বলে যে বোঝাই তোমায়, ওহে শ্রীমান গোভিল
বেজায় মন্দ লাগে আমার সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"হতেও পারে লাগবে ভাল, চাইলে পরে পাবে আরও,
দেবো নাকি গাছের মাথায়? বসবে ডালে, খাবে পাতায়?"

"আঃ, এ তো দেখি মহা বিপদ! ফিঙের মতন সাঁটল আপদ।
জুটল এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদ, তবু চাখব না এই বিটকেল স্বাদ।
চাই না কোনও বাক্সে পুরে, কিংবা বিশাল থালা জুড়ে,
কিংবা কোনও ফরাশ পেতে ছোট্ট ইঁদুরছানার সাথে,
অথবা এক খোলা মাঠে খ্যাঁকশিয়ালের পাশে বসে।
হেথায়ও নয়, হোথায়ও নয়, এই দুনিয়ার কোত্থাও নয়,
কোনমতেই খাব না ওই সবুজ ডিমের ডেভিল।
কী বলে যে বোঝাই তোমায়, ওহে শ্রীমান গোভিল
বেজায় মন্দ লাগে আমার সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"ওই যে দাদা ট্রেন আসছে, কুঝিক্-ঝিক্ তাল ঠুকছে,
ট্রেনে বসেই নাহয় শেষে খেলেন একটু রসে-বসে,
গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমি বিষ্ণু গোভিল,
নতুন অভিনবের রাজা এই সবুজ ডিমের ডেভিল।"

"দোহাই তোমায়!
ট্রেনেও না, গাছেও না, তুমি দেখছি ছাড়বেই না!
সম্ভব নয় বাক্সে পুরে, সম্ভব নয় থালায় জুড়ে,
সম্ভব নয় ফরাশ পেতে পুঁচকে ইঁদুরছানার সাথে,
কিংবা খোলা মাঠের ধারে খ্যাঁকশিয়ালের পাশে বসে।
মশাই আমি হাত জুড়ছি, দরকারে ভাই পায়ে পড়ছি,
লক্ষ্মী দাদা, দোহাই তোমার, ছাড়বে কি আজ পিছু আমার?"

"ঘুরঘুট্টি টানেল মাঝে, না করা কি তোমায় সাজে?
অন্ধকারে চোখটা বুজে, দিলেই নাহয় মুখে গুঁজে।"

"অন্ধকারেও পারব না তা, কী যে তুমি বলছ যা তা।"

"বাহ! এই তো এলাম বাইরে আবার,
বৃষ্টি মাথায় করবে সাবাড়?"

"পারব না যা, করব না তা, বলছি এত, বুঝছ কথা?
ট্রেনে চড়ে, অন্ধকারে, কিংবা বৃষ্টি মাথায় করে,
ইঁদুরছানা, শেয়ালসাথে, ফরাশ পেতে, মাঠের ধারে,
বাক্সে পুরে, থালা জুড়ে? নাঃ, দিলাম বালি তোমার গুড়ে,
হেথায় হোথায় কোত্থাও নয়, চাই না তোমার সবুজ ডেভিল,
বললাম না অতি বিস্বাদ, শুনছ কথা, বিষ্ণু গোভিল?"

"এতই তোমার মন্দ লাগে আমার সবুজ ডিমের ডেভিল?"

"এতক্ষণ তো এই কথাটাই বলছি তোমায় ব্রাদার গোভিল।"

"আচ্ছা ধরো, এই যদি দিই, আস্ত একটা ছাগল সাথে?"

"এই মরেছে, এ তো দেখি কিছুতেই হাল ছাড়বে না যে!"

"যদি করো নৌকা সফর, সবুজ ডেভিল লাগবে জবর।"

"না! না! না!
নৌকোয় নয়, রেলেও নয়, নয়কো ছাগল, শেয়াল পাশে।
অন্ধকারে? গাছের মাথায়? হাত জুড়ছি, ছাড়ো আমায়।
খাই না সেসব বাক্সে পুরে, কিংবা বিশাল থালা জুড়ে,
চাই না আমার সবুজ ডেভিল, ওহে শ্রীমান বিষ্ণু গোভিল।"

"বলছ বটে অনেক ভাবে, মুখটি তোমার করে কালো,
হলফ করে বলতে পারো? ধরো যদি লাগেই ভালো?"

"সাতকোটি বার বললে বোধহয়, বুঝবে তুমি বিষ্ণু গোভিল,
গিলতে আমি পারব না ওই তোমার আজব ডিমের ডেভিল।"

"আমি বলি, সাহস করে একবারটি চেখেই ফেলো,
হতেও পারে সবুজ ডেভিল লাগবে তোমার ভীষণ ভালো।"

"ক্ষান্ত দেবে? রক্ষে করো! কেমন করে বোঝাই বলো,
পিছু ছাড়ার শর্তে আমি চাখতে পারি তোমার ডেভিল।
নিজের চোখেই দেখতে পাবে তোমার ডিমের ডেভিল খেয়ে
বিচ্ছিরি ওই স্বাদের চোটে কেমন মুখের ভঙ্গী ফোটে...
মমম্···
মন্দ তো নয়!
আমি বলি বিষ্ণু গোভিল, ভালই তো এই সবুজ ডেভিল!
আহা! বলো যদি খেতে রাজী, নৌকো, ছাগল, বৃষ্টি সাথে,
কিংবা ট্রেনে, কিংবা গাছে, অন্ধকারেও মর্জি আছে,
খেতে পারি ফরাশ পেতে, ছোট্ট ইঁদুরছানার পাশে,
অথবা সেই খোলা মাঠে, খ্যাঁকশিয়ালের পাশে বসে।
খেতে পারি হেথায় হোথায়, এই দুনিয়ার সব জায়গায়।
দারুণ তোমার সবুজ ডেভিল, ধন্য তুমি বিষ্ণু গোভিল।"

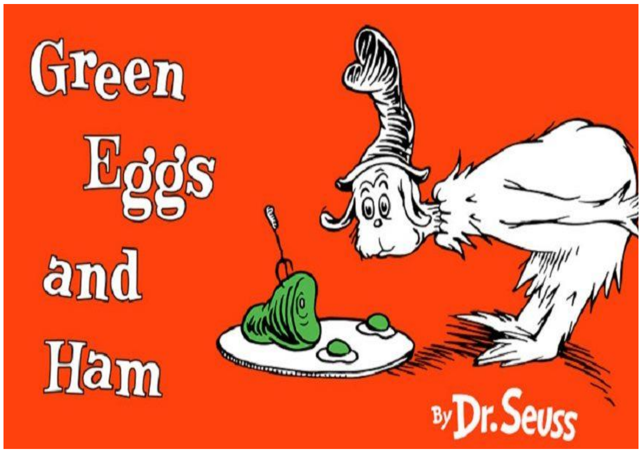

দুঃখ দিতে চেয়েছ

বৈশাখী চক্কোত্তি

তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছ,
আমার মনভূমিতে এক একটি কাঁটা তারের বেড়া পুঁতেছ।

যন্ত্রণায় ছটফট করেছি আমি, স্বপ্নের ডানা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেছ,
শুক্তি থেকে মুক্তকে ছিনিয়ে আলাদা করে তার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ।

নিঃশব্দ চিৎকারে আমার কান্নারা ঝরা বকুলের মতো ছেড়েছে শ্বাস,
রক্তাক্ত তোমার অধিবাসের অত্যাচারে আমার বুকের ঘন নীল জলোচ্ছ্বাস।

তোমার উষ্ণ ওষ্ঠের পরশে পুড়েছে আমার ত্বক, হয়েছে ক্ষত বিক্ষত,
বিন্দু বিন্দু শিশিরসম অশ্রু ঝরেছে, ঠিক যেন অন্তহীন মৃত অনুভূতি যত।

আমার উদ্দাম প্রেমকে নিয়েছ কেড়ে, উচ্ছ্বাসকে নিয়ে গেছ ভাঁটায়
নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, উন্মাদ আমি উষ্ণ আলিঙ্গনের অপেক্ষায়।

ভালবাসার নির্যাসকে তিলে তিলে মেরেছ, বিশ্বাস হয়েছে পচনশীল,
মন হারানোর রাস্তায় ভীষণ ঠোক্কর, বিবাদ, দ্বন্দ্ব আর শুধুই মতের অমিল।

ক্ষত বিক্ষত করেছ বার বার শাণিত অস্ত্রাঘাতে মনের মাধুরীকে, চুপ দেখি আমি,
এত কিছুর পরেও, সব ছিনিয়ে সত্যিই কী আমায় দুঃখ দিতে পেরেছ তুমি?

জীবনের ক্যানভাসে জলরং

সফিক আহমেদ

জলরং আঁকা হয় পরতে পরতে
ছাইরঙা ছবিগুলো ফ্যাকাশে আকাশে
দিগন্তে মিশে যায় রঙের অভাবে
আজকের ছবিগুলো সামনের সারিতে
জ্বলজ্বল করে আছে রঙের ছটাতে

প্রথম দেখা, প্রথম কথা
প্রথম প্রেম, প্রথম অভিমান
শেকল ভাঙা, মুক্তির স্বাদ
হারিয়ে যাওয়া, হারিয়ে পাওয়া
ক্রমাগত পিছু হেঁটে সময় সরণিতে
ভিড় করে ছাইরঙা দূরের আকাশে

কিছু স্মৃতি, কিছু কথা, কিছু মুহূর্ত
দূর দিগন্ত থেকেও
পাঠায় অতিজাগতিক তরঙ্গ
স্বপ্নহীন বিনিদ্র রাতে
আজও শোনায় মালকোষ, বেহাগ, মধুবন্তী

হয়তো হবে না দেখা
তবুও ভাবি আজকের মেঘের ঘনঘটা
আনবে অন্য বৃষ্টি
ভরে দেবে নয়নজুলি
মৃগনয়না আসবে আবার সাজঘরে
তাই আজও জ্বেলে রাখি বাতি
আজও আমার ছবিতে রং তোমারি নামের।

মহানগরের দিন রাত্রির
রং, আলো, জাকজমক কোলাহলেও
আমি তোমাকে খুঁজি এখনো
দিগন্তে মিশে যাওয়া ফ্যাকাশে আকাশে
আমি আমাকেও খুঁজি এখনো
দিগন্তে মিশে যাওয়া ফ্যাকাশে আকাশে।

শব্দ

মিশা চক্রবর্তী

ভীষণ শব্দ! কানে আঙ্গুল!
চিৎকারেতে টেকাই দায়!
যেজন যত জোরে চেঁচান,
ভিতর ততই রিক্ত হায়!

ভিতর ভাঙুক, নিটোল থাকুক,
দেখনদারির ঠুনকো কাঁচ,
তোমার আমার সবার এখন,
রং মাখানো অবাক ধাঁচ!

কান-জ্বালানো মন-ভোলানো
কথার পিঠে কথার বাঁক;
কথার কথা অনেক হ'ল –
চুপকথারা মুক্তি পাক!

আজ যে কথা কাল থাকে না
এমন কথায় কী আর কাজ?
চারপাশেতে চুপের প্রলেপ,
কথারা যাক নিপাত আজ!

নীল

উদ্দালক ভরদ্বাজ

নীল তো সেই আকাশ-জোড়া মন
   বিকেলবেলার মেঘ
      মুখ লুকোতে আসার;
নিথর নীল রাত,
   হারিয়ে যাওয়া গান
      সুখের ভালবাসার...

নীল তো সেই দুষ্টু রাখাল ছেলে
   ছাড়ে না আর আঁচল
      ঠোঁট ছুঁয়ে দেয় এসে
         একটু একলা পেলেই
সকল ক্ষোভের শেষে
   অনন্তের জলে
      সেই পাবে তার খোঁজ
         যে ডুব দেবে, সেই...

নীল তো সেই একলা পাগল কবি
   ঝড়ের রাতে একা
      বেরোয় অভিসারে;
         ছোঁয়ার খেলায় যাকে
            হারিয়ে ফেলে মেয়ে
অনেক দিনের পর
   সকল কাজ সারা, যখন-
      ফেরে বাদল ধারা
         তখন, নীরব অশ্রুধারে
            দেখে কেবল চেয়ে...

আসলে নীল একলা মনের রঙ
   আমরা শুধু ছড়িয়ে দিই তাকে
      আকাশ পারে, কবির গানে,
         একলা হওয়ার ফিকির

আসলে নীল, আগুন পাখি,
প্রাণের ধিকি ধিকির...
অনন্তময় ঘুরে বেড়ায়
   সুখের করে খোঁজ
মনের পাখি মনেই থাকে তবু
আমি জানি, তুমিও তাকে ছুঁয়ে
   হারিয়ে যাও রোজ

শুধু কিছু কবিতা রচনা হবে বলে

উদ্দালক ভরদ্বাজ

যেন এই নিষ্পাপ জীবন
শুধু কিছু কবিতা রচনা হবে বলে

যেন এই ব্যর্থ আকাশ
শুধু কিছু কবিতা রচনা হবে বলে

যেন এই অভ্রান্ত নীল, ভেসে যাওয়া,
   ভেসে থাকা ক্লান্ত ডানা
শুধু কিছু কবিতা রচনা হবে বলে

যেন ওই মৃন্ময়ী রূপ, ফুল্ল চরণ, নিখুঁত সুষমা
শুধু কিছু কবিতা রচনা হবে বলে

বৃষ্টি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

স্বপ্ন একটা আলোর নাম তোমার চোখে দেখি
বৃষ্টি একটা নদীর নাম একলা বয়ে চলে

ভালবাসার অন্য গতি, অন্য অভিধায়
বেদনাবহ ক্লিন্ন জল শূন্যে বয়ে যায়

আমার মন একলা কোন মাঠের পারে বসে
তোমায় ভাবে, তোমার দুটি পায়ের পাতা ঘিরে

ছড়িয়ে থাকে হারানো ফুল ফুরনো দরজায়
বৃষ্টি একটা আলতো নদী বুকের পরিখায়।

মালাকার

ভজেন্দ্র বর্মন

কত না সুন্দর রঙ্গিন ফুল!
এরা হয় আরো বেশী মনোহর
যবে গাঁথে মালা দক্ষ মালাকার –
এ মালা যে পায়, সে হয় ধন্য!

যবে কাগজের পাতায় পাতায়
শব্দের মালাকার গড়ে শব্দ-মালঞ্চ
তখন পাতাগুলো হয় গ্রন্থসম্ভার –
এ হয় জ্ঞানভান্ডার সবার জন্য।

উৎসর্গঃ
জ্ঞানভান্ডার প্রদান করে আসার জন্য
'শব্দের মালাকার' মালবিকাকে।

১০/২৪/২০২১

(উপরোক্ত কবিতাটি গত বিজয়া সম্মেলন সভায় ভজেন পড়েছিলেন।
আমাদের জন্য সেটিই ছিল হিউস্টনে বাস করাকালীন শেষবার সাহিত্য সভায় যোগদান করা।
আমরা দুজন সেদিন সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম আমাদের পাঠচক্রের বন্ধুদের আন্তরিক অভিব্যক্তিতে।

মালবিকা চ্যাটার্জী)

বোঝে না তা ঠিক নয়

রঙ্গনাথ

বোঝে না তা ঠিক নয়; হিসাব রাখে না –
হচ্ছে কত এটা সেটা, দেখেও দেখে না।
অর্থের বড় ছড়াছড়ি, সবাই ধনী হতে চায়
সহজ পথ চায় হেতু, ঝোঁক কালো টাকায়।

হচ্ছে সদা বাটপারি, চুরি চামারি কত
চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ডাল-ভাতের মতো।
শঠতায় আর ঘুষ নিতে অনেকেই বড় পাকা;
ভেজাল আজ সবাই মানে; রয় না তা ঢাকা।

হচ্ছে কত খুন-খারাবি, অনাচার অহরহ
সারাদেশ অন্ধকারে, খুশী থাকা দুঃসহ।
স্বার্থপর হেতু কেহ ভাবে না কারো কথা
মানুষের এ ভিন্নরূপে নেই মমতা-সততা।

সবই হ'ল চেনাজানা, জেনেও জানে না
সাক্ষী হতে চায় না কারণ প্রাণ যাবে কিনা!
কুকর্ম সব অনেকে জানে, কেউ একা নয়
আইন জানে প্রশাসন জানে, সবাই নীরব রয়।

নীতি-সাহস যা থাকা চাই ততটা কারো নেই
বলতে গেলে হাল ছেড়ে দিয়েছে অনেকেই।
অপকর্মে আজ ক্ষতিগ্রস্ত সমাজ আর দেশ
জানে না কোথায় যাচ্ছি, কোথায় এর শেষ।

বড় আশা ঠিক হবে সব প্রজন্মদের হাতে
বর্তমানের কলুষিত যুগ মুছে যাবে তাতে।

যেতে হবে

সুব্রত ভট্টাচার্য

একদিন তো যেতেই হবে
যেতে তো হবেই!
থাকব বলে তো আসিনি
কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করে চলে যেতে হবে ভাবিনি।
দিয়ে গেলাম আমার কাঞ্চন ফুলের কুঁড়িগুলো
পোষ্য সারমেয় লুসিকে।
অস্তিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে
দিগন্তের চেয়ে আর একটু দূরের পথে যেতে হবে।
আজ কেমন আকাশে নীরবে তোমার নীল শাড়িটা উড়ছে
বসন্ত বাতাসে ভেসে আসছে
অলোকদের বাড়ির সামনের বাগানের জুঁইফুলের গন্ধ
আজ কেমন ভীরু মেঘের নিস্তব্ধতা
শুধুমাত্র একটি বাতাসের শব্দ এই দীর্ঘ দীর্ঘায়িত রাতে।
ওটাই ছিল আমার চোখে শেষ প্রাণসংহারী মায়া
সেদিন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রেখেছিলাম
নিয়তির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে।
বাওরের উপর চিল উড়তে দেখা গেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
কিছু খুঁজছিল নিখুঁত নিষ্ঠুরভাবে
এখন শুধু বাতাসের একটানা শব্দ অন্য কিছু নয়
না কোনো পাশের বাড়ির বৃদ্ধের কাশির শব্দ
না কোনোও রাত পাহারার পুলিশের ভারী বুটের শব্দ
না কিছু আমলকী পাতাঝরার শব্দ
কোনো অবাঞ্ছিত নবজাতকের কান্নার শব্দ...
তাও নয়!
এখন শুধু বাতাসের শব্দ,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসময়...
আর কিছু নয় এই রাতে।
এখন শুধু সাড়ে তিনহাত ভূমির ওপর শুয়ে ভাবতে থাকি –
হাজার অক্ষরভরা উপন্যাসের
কেবল দুটি শব্দ
যেতে হবে।

প্রেম ও মৃত্যু

শেলী শাহাবুদ্দিন

মৃত্যু আমারে বড় ভালবাসে, যেন তার প্রিয় সখা,
বারেবারে তাই নিতে এসে মোরে, মোটেই দেয় না দেখা।
স্বজনেরা ভাবে, বেড়ালের প্রাণ, "এ মড়া মরিলে বাঁচি",
আমারও সে কথা, অকারণে তাই, যেতে হবে শুনে নাচি।

এই আসা-যাওয়া, এই ভালবাসা, এই রহস্য খেলা,
কতকাল আর নাচাবে আমায়, রাহুর গ্রাসের বেলা?
কখনো সে আসে নিয়ে যেতে মোরে, অথচ প্রাণটা রেখে,
হৃদয় ধমনী বেঁধে রেখে যায়, পথ যায় তার বেঁকে।
আবার সে এসে, বলে যেন হেসে, এইবারে খেলা শেষ,
অথচ আমার স্নায়ুগৃহ ভেঙে, মিলায় সে দূরদেশ।
এভাবেই তার চলে আসা-যাওয়া, এই তার ভালবাসা,
আমিও এখন ভালবাসি তার, ছলনা সর্বনাশা।
এখনো জানি না, কী তার খেয়াল, কবে শেষ হবে খেলা?
খেলার ছলেই হোক, তবে হোক, মিলন শেষের বেলা।

আজ মনে পড়ে, অরুণ প্রভাতে, প্রথম প্রেমের স্মৃতি,
কী অবাক মিল, সেদিনের সাথে মৃত্যুর এই প্রীতি!
এমনি সে ছিল রহস্যময়ী, কাছে এসে বারবার,
চলে গেছে দূরে, বিদ্যুৎ হেনে, কেড়ে নিয়ে অধিকার,
যখনই এসেছে, সূর্য হেসেছে, জীবনে জেগেছে আশা,
গেছে চলে দূরে, অবহেলাভরে, পদতলে ভালবাসা।
কখনো সে এসে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে, হৃদয়-বীণার তার,
কখনো বা শুধু স্নায়ুমন্ডলী, করে গেছে চুরমার।
হলাহল আর অমৃতের স্বাদ দিয়েছিল একই নারী,
বিষযন্ত্রণা, নিরাময় সুখ, মৃত্যুর অনুসারী।

হলাহল আর অমৃত মেশানো জীবনের পথ হেঁটে,
আজীবন তবু বুঝিনি কিছুই, ক্লান্ত হয়েছি ঘেঁটে।
এখন জীবনে গম্য লগনে, বুঝি আমি অবশেষে,
মৃত্যু ও প্রেম একই সৃজন, এভাবেই তারা মেশে।

মানুষ তো ভাবে গরল মৃত্যু, প্রেম শুধু অমৃত,
আমারে শেখাল দুজনেই তারা, হলাহল-অমৃত।
ভালবাসি যারে, মৃত্যুর সাজে, শেখাল আমারে সে,
মৃত্যুর মতো, আজও সে আমার, মৃত্যুরে ভালবেসে।

রক্তবীজ

অদিতি ঘোষদস্তিদার

"ধুস, একফোঁটা জল নেই বোতলটায়। তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ! জলটা কখন শেষ হয়ে গেছে খেয়ালও করিনি! যা হ'ল! একটা দিনও যেন ঝামেলা থেকে নিস্তার নেই!"

জ্যাকেটের পকেট থেকে ফাঁকা বোতলটা বের করে বিড়বিড় করল দিয়া। ঠোঁট ফাঁক হলেও শব্দ অবশ্য বেরোল না।

অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে কখন নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি একেবারে। সব রাগ বিরক্তি এখন বোতলটার ওপর। ছিপিটা খুলে জলে ছুঁড়ে ফেলে বোতলটা প্রাণপণে মুচড়ে ছুঁড়তে যাবে, টান পড়ল ওড়নায়।

একটা বাচ্চা মেয়ে। পরনে একটা রংওঠা জামা আর সস্তা জ্যালজেলে সোয়েটার।

উফফ্, এখানেও ভিখিরি! শান্তি নেই কী একটুও! একটু আগেই এদেরকে নিয়েই একচোট ঝগড়া হয়ে গেল জ্যোতির সঙ্গে।

ওরা একদঙ্গল এসেছে কুলতলিতে পিকনিক করতে, পিয়ালী নদীর ধারে। জায়গাটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অনেকটা দক্ষিণে। পিকনিকস্পটগুলো অবশ্য নদী থেকে একটু দূরে।

আসার পর জলখাবার – কচুরি, আলুরদম আর মিষ্টি।

জ্যোতি ঘুরে ঘুরে তদারক করছিল। বড্ড সর্দারি মেয়েটার!

- "খাবার কেউ নষ্ট কোরো না, যা বাঁচবে ওদের দিয়ে যাব!"

দিয়ার নজরে পড়েছিল একটু দূরে উঁচু মাটির ঢিবির ওপর দাঁড়ানো কিছু ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে। গায়ে তাপ্পিমারা কাঁথা বা পুরনো রোঁয়াওঠা কম্বল।

- "সব জায়গায় তোর এই পাকামি ভাল লাগে না রে, একদিন খেতে দিয়েই তুই এদের ভিখিরির দশা ঘোচাতে পারবি? যত্তো সব!"

ইচ্ছে করেই প্লেটের আধখাওয়া খাবারগুলো ডাস্টবিনে ঢেলে রেগে বেরিয়ে এসেছিল দিয়া। পেছন থেকে চেঁচিয়ে জ্যোতি বা অন্যেরা কী বলেছিল কান দেয়নি।

জায়গাটা শুনশান। আজ বুধবার বলে অন্য পিকনিক-পার্টির ভিড়ও তেমন নেই।

"যা তো এখান থেকে!" বলে খেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে থমকাল দিয়া।

মেয়েটার পেছনে জড় হয়েছে আরো গোটা কয়েক একই চেহারার বাচ্চা। আর তাদের থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। প্যান্ট হাঁটু অবধি গোটানো, গায়ে পাতলা সার্ট, হাতে একটা বস্তা।

ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল দিয়ার। গলায় সোনার চেনটাতে হাত গেল নিজের অজান্তেই।

- "ওটা আমায় দাও দিদি!"

বুকটা কেঁপে উঠল দিয়ার!

"না!" বলতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বেরোল না।

- "আপনার হাতের বোতলটা ওকে দিয়ে দিন, এখানে প্লাস্টিক ফেলবেন না! রবি, জল থেকে ছিপিটা তুলে ফেল!" গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ।

ওঃ,এই ব্যাপার! উফফ্, নিস্তার নেই কোথাও এই মাতব্বর-গুলোর হাত থেকে! জ্যোতিরা কী রক্তবীজের ঝাড়! সব জায়গায় গজিয়ে উঠছে!

বিরক্ত মুখে বোতলটা মেয়েটার হাতে দিয়ে ফিরে চলল দিয়া।

মেক্সিকো - প্রথম প্রবাসে

শান্তনু চক্রবর্তী

॥১॥

ভারত থেকে মেক্সিকো? তাও, ড্রাগ ব্যবসায়ে যুক্ত হবার জন্য বা মারিয়াচি নাচবার জন্য অথবা ফুটবল খেলবার জন্য নয়, পড়াশুনোর জন্য? সেখানে আবার কেউ যায় নাকি? লোকজন তো আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে যায় পড়াশুনো করতে! সেখানে মেক্সিকো যাওয়া কি এক ধরনের অবনমন নয়? আমি মেক্সিকো যাচ্ছি শুনে আমার এক আত্মীয় ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'মাক্কু ল্যান্ড'! আমি জানি না এই শব্দযুগলের কী মানে, কিন্তু শুধু ভারতে বাস করা ভারতীয়রাই নয়, আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছেও মেক্সিকো হ'ল সেই দেশ, যেখান থেকে দলে দলে লোকজন রোজ বেআইনীভাবে সীমানা পেরিয়ে আমেরিকায় ঢোকে একটু ভালভাবে বাঁচবার জন্য; এবং এসেও তারা দিনমজুরের চাকরির বেশী আর কিছু জোটাতে পারে না। এদের এভাবে আসা আটকানোর জন্য আমেরিকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসায়। এরকম একটা দেশে আমি গেলাম কেন? কীসের আশায়? আর এত ভাল ভাল দেশ থাকতে মেক্সিকোতেই বা যাওয়া কেন? আসল কথা হ'ল আমি অন্য কোথাও চান্স পাইনি যে!

আসলে বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে পিএইচডি করতে করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়লেও পিএইচডি শেষ করার পর থেকে আমার পরিকল্পনা হ'ল অ্যাকাডেমিকসে ফেরা। প্রথমে ইচ্ছে ছিল ভারতেরই কোনো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট-এ চেষ্টা করব। কিন্তু আমার পিএইচডি গাইড বি ভি রাও থেকে শুরু করে অনেকেই বললেন বিদেশে চেষ্টা করা উচিত। শেষ পর্যন্ত আমিও মেনে নিলাম। এদিকে পিএইচডি শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার কলকাতা থেকে মুম্বাইতে ট্র্যান্সফার হয়ে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষর ইচ্ছে আমাকে আরও বেশী করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজে জড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আমার যেহেতু অন্য মতলব, তাই মুম্বাইতে এসে থিতু হতে কয়েকটা মাস নেবার পরই আমি শুরু করলাম আই এম এস (ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথেমেটিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স)-এ চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো দেখে অ্যাপ্লাই করা। আমি অ্যাপ্লাই করলাম গোটা চার পাঁচ জায়গায়, তার মধ্যে একমাত্র মেক্সিকোর গুয়ানাখুয়াতো শহরে অবস্থিত সেন্ট্রো দে ইনভেস্তিগাসিওন এন মাথেমাতিকাস (সংক্ষেপে সিমাত) থেকে একটা অফার পেলাম – পোস্টডকের অফার। সেখানকার প্রফেসর হোসে আলফ্রেদো লোপেজ মিমবেলা আমাকে ওঁর ছাত্র হবার জন্য নির্বাচিত করেছেন। আমি ইন্টারনেট সার্চ করে দেখলাম – মেক্সিকো যেমনই দেশ হোক না কেন, এই ইনস্টিটিউটটি কিন্তু নামকরা। ভাল ভাল ফ্যাকাল্টি রয়েছে, তাঁদের কাজের মান আই এস আই-এর ফ্যাকাল্টিদের থেকে কিছুমাত্র নিম্নতর নয়। তাই ঠিক করলাম যাব। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে নয়, ছুটি নিয়ে। কারণ পোস্টডক তো আর পার্মানেন্ট চাকরি নয়; কিন্তু এই ছুটি পাওয়াই হয়ে গেল এক ঝকমারি ব্যাপার! প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার সান্তানাম আমাকে বলেছিলেন, "তোমরা এসব কী শুরু করেছ বলো দেখি? এরকম হলে অফিসের কাজকর্ম কী করে চলবে?" উনি পরিষ্কার লিখে দিলেন "নামঞ্জুর"। কিন্তু আমারও যে প্ল্যান রয়েছে! অন্ততঃ একটিবারের জন্য তো আমাকে চেষ্টা করতে হবে ঠিকঠাক পড়াশুনো করে ভাল কিছু করার। তাই আমি লেগে থাকলাম। আমার মনে হ'ল শেষ পর্যন্ত আমি সফল হবই।

এরপর কিছুদিন ধরে চলল প্রস্তুতিপর্ব – মেক্সিকোর ভিসা নেওয়ার জন্য দিল্লী যাওয়া, ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা, স্প্যানিশ শেখা, আমার মেক্সিকোর সুপারভাইজার মিমবেলাকে আমার দেরীর ব্যাপারে জানানো ইত্যাদি। হ্যাঁ, ছুটি সঙ্গে সঙ্গে নামঞ্জুর হওয়ায় দেরী হওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল। মিমবেলা বললেন, যখন আমি গিয়ে পৌঁছাব তখন থেকেই আমার এক বছরের গণনা শুরু হবে। দিল্লীতে গিয়ে ভিসা পেতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু সেখানকার ভিসা অফিসার মিস্টার পারেদেস বলেছিলেন, আমি যদি আমার ছুটি মঞ্জুর হওয়ার কাগজ দেখাতে না পারি তো ওঁর বসেরা ওঁর গলা কেটে নেবেন। তাই ভিসা হাতে পেলেও চুপচাপ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব, এমন সম্ভাবনা নেই। ট্র্যাভেল এজেন্ট মিস্টার বামনের অফিস মুম্বাইয়ে বান্দ্রাকুর্লা কমপ্লেক্সে আমার অফিসের থেকে হাঁটা দূরত্বে। সুযোগ পেলেই সেখানে চলে যেতাম। মিস্টার বামনকে বলে রাখলাম আমার যাওয়ার দিনের

অনিশ্চয়তার কথা | উনি আমার কথা মাথায় রাখবেন জানিয়েছিলেন | শনিবার অফিস থেকে ফেরার পথে তাহিল ভামবোয়ানি নামে এক ভদ্রলোকের কাছে স্প্যানিশ শিখতে শুরু করলাম | ওঁর বাড়ি খারে | উনি ইংরেজি ও স্প্যানিশ দুটি ভাষাই জানেন | নিজের মাতৃভাষা সিন্ধি জানেন কিনা আমার আর জানা হয়নি | আমি ওঁর কাছে চারটে লেসন নিয়েছিলাম | লাভ হয়েছিল যে আমি সব সংখ্যা স্প্যানিশে বলতে শিখে গিয়েছিলাম | একদিন আমার সামনে ওঁর বোন, ঈশ্বরীর ফোন এসেছিল – উনি বোনকে "ওলা ঈশ্বরী" বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং স্প্যানিশে কথা বলেছিলেন | ওঁরা সম্ভবত ছোটবেলা এমন জায়গায় বড় হয়েছিলেন, যেখানে প্রথম ও প্রধান ভাষা ছিল স্প্যানিশ | চারটের পর আর কোনো লেসনের সুযোগ ছিল না | আমি ওঁকে শেষ সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি কি পারব মেক্সিকোয় গিয়ে কথাবার্তা চালাতে?" উনি বলেছিলেন নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারব |

শেষ পর্যন্ত অনেক জল গড়িয়ে যাওয়ার পর আমার ছুটি মঞ্জুর হ'ল | ছুটি মঞ্জুর হতেই আমি প্রমাণপত্র ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিলাম মেক্সিকো এমব্যাসিতে | আর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বামনকে বলে টিকিট বুক করিয়ে নিলাম | তবে তার আগে আবার একপ্রস্থ খবরাখবর নেওয়া | বামন বলছিলেন টিকিটের দাম ৯৮,০০০ টাকা | ভাড়া বেশী হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন যে আমার ফ্লাইট ইউএসএ হয়ে যাচ্ছে না, তাই ভাড়া বেশী | এখানে উল্লেখ্য, ইউএসএ-র ভিসা নিয়ে নানান সমস্যা হয় বলে আমি বামনকে অনুরোধ করেছিলাম ইউ এস এ রুট এড়িয়ে চলতে | তাই বলে ভাড়া এত বেশী? আসলে আমি খবর নিয়ে জেনেছিলাম ইউএসএ যেতে হলে ৬০,০০০-৬৫,০০০ টাকায়ই হয়ে যায়, সেখানে মেক্সিকো যেতে এত বেশী লাগছে কেন? মনে এক সন্দেহ উঁকি দিল – উনি বিজনেস ক্লাসের টিকিট ধরিয়ে দেননি তো? ফাইনাল পেমেন্ট করে টিকিট হাতে পাওয়ার দিন আর থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম সে কথা | এর যে উত্তরটি উনি দিয়েছিলেন, তা বাঁধিয়ে রাখার মতো, "নাহ, এটা বিজনেস ক্লাসের টিকিট নয়, তবে বিজনেস ক্লাসের সব সুবিধেই আপনি পাবেন |" এ যেন সোনার পাথরবাটি! এই উত্তরের মানে আমি সেদিনই পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম যেদিন আমি প্লেনে উঠেছিলাম | সে পরের কথা |

এতদিন শুধু নিজের কথাই ভেবে গেছি | কী করে আমার ছুটি হবে আর কী করে আমি যাব | আমার স্ত্রী, লোপার কথা এবং আমাদের পরিবারের আগামী অতিথিকে নিয়ে চিন্তা করিনি | আমার সন্তান স্বদীপ্তর জন্মের দিনও যে দ্রুত এগিয়ে এল বলে! ছ'মাসের প্রেগন্যান্ট লোপা কি পারবে এই অবস্থায় আমার সঙ্গে যেতে? ডঃ সুসান সোডার পরিষ্কার 'না' বলে দিলেন | অগত্যা লোপাকে চলে যেতে হবে শিলচরে ওর বাবা-মা'র কাছে | ব্যারাকপুরে আমার মা'র কাছে রেখে যাওয়া অসম্ভব, কারণ আমার মা একা মানুষ, ঠিকমতো লোপার যত্নআত্তি করতে পারবেন না | ওর বাবা-মা'র কাছে বরং ও ভাল থাকবে | এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা মুম্বাই ছাড়বার প্রস্তুতি শুরু করলাম | আমাদের শখের জিনিসগুলো জলের দরে বেচে, যৎসামান্য জিনিস নিয়ে আমরা ব্যারাকপুরে এসে উঠলাম | শিলচর থেকে আমার শ্বশুরমশাই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে ও লোপাকে নিয়ে যেতে |

এত কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে পারছি বলে মনে যেমন আনন্দ ছিল, তেমনি লোপাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যেতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল | মাকে, লোপাকে এবং অন্যান্য সবাইকে বিদায় জানিয়ে প্রথমে গেলাম মুম্বাই; সেখানে দিন দুয়েক থেকে তারপর আমার মেক্সিকোর ফ্লাইট | মুম্বাই থেকে বিদায় নেবার আগে সেখানের অন্যতম দ্রষ্টব্য, মেরিন ড্রাইভ আরেকবার দেখার ইচ্ছেটা আর দমিয়ে রাখতে পারিনি | এর আগে যখন এসেছিলাম, তখন লোপা ছিল সঙ্গে | এবারে একা কিছুক্ষণ জায়গাটা উপভোগ করতে করতে লোপার সঙ্গে এখানে কাটানো সময়ের কিছুটা স্মৃতি-রোমন্থন করে নিলাম | তারপর এই রোমান্টিক মহানগরীকে বিদায় জানিয়ে আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের শুরু |

||২||

আগে বলেছি মিঃ বামন আমাকে একটা ৯৮,০০০ টাকার টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এটা বিজনেস ক্লাস নয়, তবে আমি নাকি বিজনেস ক্লাসের সব সুবিধেই পাব | এরপর প্লেনে উঠেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার সীট বিজনেস ক্লাসেরই | আমি এই ক্লাসের সব সুবিধেই পাচ্ছি – কেবিনে ঘন ঘন গরম, ঠান্ডা পানীয় পরিবেশন যার অন্যতম | অনেক দেরিতে বোধোদয় হয়েছিল | অকারণে আমাকে এতগুলো টাকা প্লেন-

ভাড়া বাবদ দিতে হ'ল! তবে সিমাত পরে আমার এই প্লেন-ভাড়া রিইমবার্স করে দিয়েছিল।

মুম্বাই থেকে লুফথান্সার ফ্লাইট ছিল অনেক রাত্তিরে। আর সেটি ফ্র্যাঙ্কফুর্টে পৌঁছেছিল সকালবেলা। এরকমই হয় ইন্ডিয়া থেকে ইউরোপগামী ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলোর বেলায় – গভীর রাত্রে ছেড়ে গন্তব্যস্থলে সকালে পৌঁছায় | যখন ঢুকলাম এয়ারপোর্টে, তখন ফ্রাঙ্কফুর্টের নিরাপত্তারক্ষীরা আমার পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করলেন না। ইউরোপে সকাল হলেও ভারতে তখন দুপুর। আমার সেলফোন ছিল না। তাই ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে হিসেবমতো পিছিয়ে দিয়েছিলাম | এরপর কলিং কার্ড কিনে মাকে ও লোপাকে ফোন করে আমার পৌঁছানোর খবর দিলাম। কলিং কার্ড কিনতে গিয়ে ডলার ভাঙাতে হ'ল | এই প্রথম ইউরো নোট আর কয়েন হাতে এল। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ছ'ঘন্টা হল্ট। এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে, খাবার খেয়ে তারপর আবার ঘুরেও সময় যেন আর ফুরোতে চায় না। অবশেষে যথাসময়ে ফ্লাইটে উঠলাম। কিন্তু ফ্লাইট সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ল না। কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা ছিল, মেরামত করার জন্য কেটে গেল এক ঘন্টা, তারপর ছাড়ল প্লেন। আগের ফ্লাইটে প্রায় অর্ধেক ভারতীয় ছিল, এই ফ্লাইটে ভারতীয় প্রায় নেই বললেই চলে | মুম্বাই থেকে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ছিল ৮-৯ ঘন্টার ফ্লাইট, আর এটি ১০-১১ ঘন্টার। সে সময় সব সীটে টিভি স্ক্রিন ছিল না, তাই প্লেন যা দেখাত, তাই দেখতে হতো। এই জার্নির মুখ্য কৌতূহল ছিল খাবার। সম্পূর্ণ বিদেশী খাবার কেমন হয়, তার প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'ল। এই প্রথম সজ্ঞানে চীজ খাওয়ার সুযোগ এল। তখন কে জানত, মেক্সিকোয় পৌঁছে এত চীজ খেতে হবে!

মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্ট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের থেকে বড়। আর বি আই-তে বসে নেট সার্ফিংয়ে জেনেছিলাম মেক্সিকো সিটি হ'ল জনসংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়; এখন অবশ্য আর তা নয়। তো যে শহর জনসংখ্যার দিক দিয়ে বড়, সে আয়তনের দিক দিয়েও নিশ্চয়ই কম যায় না! তাই এয়ারপোর্ট থেকে অসংখ্য ফ্লাইট। এয়ারপোর্টের গোলোকধাঁধায় সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়। আর যেখানে স্প্যানিশই বেশী বলা হচ্ছে, ইংরেজি বলা হলেও কখন বলা হবে তা অনুমান করা যায় না, সে জায়গায় হারিয়ে গেলে সত্যিই মুশকিল | আমাকে বলা হয়েছিল চেক ইন-এর জন্য ১৭ নম্বর কাউন্টারে যেতে | কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর তাহিল ভামবোয়ানির শিক্ষা ভুলে স্প্যানিশে ১৭-কে যে দিয়েসিসিয়েতে বলে, সেটাও মনে করতে না পারায় কাউকে যে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় ছিল না। তবে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গিয়েছিলাম সেই কাউন্টার | এরপর মেক্সিকো সিটি থেকে লেওনের ফ্লাইটে উঠে আপাতত শান্তি। এটাই এবারের মতো আমার শেষ ফ্লাইট। এত দীর্ঘ প্লেন জার্নির পর আমার ফ্লাইট ছাড়বার আগেই ঘুম এসে গেল | একেবারে লেওনে নামবার ঠিক আগে ঘুম ভাঙল | মাত্র ৩৫ মিনিটের ফ্লাইট, তবু মনে হ'ল ঘুমটা বেশ জমিয়ে হয়েছিল।

মিমবেলা বলে রেখেছিলেন – যত রাতই হোক, এয়ারপোর্টে সিমাতের লোক থাকবে, আর আমাকে রাইড দেবে সিমাতেল অবধি | সিমাতেল হ'ল সিমাতের গেস্ট হাউস, যেখানে গিয়ে আমি উঠব। যদ্দুর মনে পড়ে, মেক্সিকোর সময় রাত সাড়ে বারোটা হয়ে গিয়েছিল | যে বয়স্ক ড্রাইভার এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে, খুবই হাসিখুশী। বেশী কথা বলবার দরকার হয়নি, আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতেই উনি কথা বুঝে যাচ্ছিলেন | তাই ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে লোপাকে ও মাকে পৌছসংবাদ দিতে অসুবিধে হ'ল না। এখানে আমি ডলার ভাঙিয়ে কিছু পেসো জোগাড় করেছিলাম মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্টেই। সে সময় এক ডলার মানে এগারো পেসো মতো ছিল | তাই লেওন এয়ারপোর্টে পেসো ব্যবহার করে ফোন করতে অসুবিধে হয়নি | ফোন করবার পর যাত্রা শুরু হ'ল | অনেক পাহাড়ি রাস্তা আর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ৩০ কিলোমিটার থেকে ১১০ কিলোমিটারের মধ্যে স্পীডোমিটারের কাঁটা নড়াচড়া করিয়ে শেষে পৌঁছানো গেল সিমাতেল-এ। এত রাত্রে আর খাওয়ার প্রশ্ন নেই। ড্রাইভার ভদ্রলোক মালসহ আমাকে তিনতলার নির্দিষ্ট কামরায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। তারপর ঘন্টা দেড়েক ধরে নিজের কিছু দরকারি জিনিসপত্র বার করে ঘরটাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে, চান করে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল আটটায় পাশের গীর্জায় ঘন্টার আওয়াজে ঘুম ভাঙল | এরপর তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট করতে গেলাম | ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে বোঝা গেল, নিজের কেরিয়ার নিয়ে লড়বার পাশাপাশি আরও একটি লড়াই শুরু হ'ল আমার – ভাষার লড়াই। এখানে যেসব খাবার বানায়, সেসবের নাম আমি

জীবনেও শুনিনি; তাই কোনটা খাব আর কোনটা খাব না, সেটা যাচাই করা বেশ মুশকিল। ডাইনিং রুমের স্টাফরা কেউই ইংরেজি বোঝে না। অতিথিরা কেউ কেউ বোঝেন, কিন্তু সবটা বোঝাতে পারেননি। একমাত্র আগোয়া মানে যে জল, সেটা আমার মনে ছিল। সবার শেষে যখন আমি জল চেয়েছিলাম, তখন মনে হ'ল কিচেনের মেন কুক যেন একটু আশ্বস্ত হলেন – অন্তত এটা আমি বোঝাতে পেরেছি, আর উনিও আমার চাওয়ামতো জিনিস আমাকে দিতে পারছেন। শেষমেশ আমি জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, এই সিমাতেলে কি কেউই নেই, যিনি একটুখানি ইংরেজি বোঝেন? তখন কেউ একজন আমাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝালেন – এখানে যিনি কেয়ারটেকার ভদ্রলোক, সেই আংখেল কাররিও, তিনি বোঝেন। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি আমার গন্তব্যস্থলে ফিরে গেলাম।

মিমবেলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। উনি ভালই ইংরেজি বলেন, ওঁর ঘর থেকে কয়েকটি ঘর পরেই আমার ঘর। এখানে আবার সেই ১৭ – আমার রুম নম্বর হ'ল ১৭। আমার ঘরে আরও একজন বসে, যে মিমবেলার কাছেই পিএইচডি করছে – আরোলদো পেরেজ। ও-ও ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। ঘরে একটাই কম্পিউটার। দুজনে শেয়ার করতে হবে। আমি গিয়েই আমার মেল চেক করলাম। লোপাকে মেলও লিখে ফেললাম। জানা গেল আমি সিমাতেরও একটা ইমেল অ্যাকাউন্ট পাব। দেখলাম ক্রিকইনফো ওয়েবসাইট-এ যেসব খেলা চলছিল, সেগুলোর স্কোরও চটপট পেয়ে গেলাম। তবে কম্পিউটারে বেশীক্ষণ বসলাম না। যেজন্য এসেছি, তাতে মন দিতে হবে। মিমবেলা বলেছিলেন বিকেলের দিকে এসে আমাকে কাজের বিষয়বস্তুটা দিয়ে যাবেন। পড়াশুনো বেশীক্ষণ হ'ল না, নানান ফর্মালিটির জন্য অনেক ফর্ম-টর্ম ফিল আপ করলাম। লাইব্রেরির কার্ড করিয়ে বই নিলাম। এসব সামলাতেই বেলা একটা বেজে গেল। ভাবলাম লাঞ্চে যাবার আগে মিমবেলাকে জানিয়ে যাই। উনি শুনে বললেন, এখানে লোকে নাকি দুটো-তিনটের আগে লাঞ্চ করে না। অগত্যা অপেক্ষা!

লাঞ্চের সময় আলাপ হ'ল আংখেলের সাথে। ইংরেজিটা খারাপ বলেন না তিনি। আংখেল আমাকে কমেরসিয়াল মেহিকানার কথা জানালেন, অর্থাৎ কিনা কমার্শিয়াল মেক্সিকানা। ওখানে গিয়ে কিছু খাবারদাবার কিনব প্ল্যান করে নিলাম – হয়তো কিছু স্ন্যাক্স আর কলা। মিমবেলা বলেছিলেন এখানে মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হয়, তাই একটা ছাতাও কিনতে হবে। খাওয়াদাওয়াটা ভালই হ'ল – বেশ এলাহী ব্যাপার – স্টার্টার থেকে শুরু করে ডেসার্ট পর্যন্ত; সব মিলিয়ে মাত্র তেত্রিশ পেসো। বুঝেশুনে খাবার চেষ্টা করলাম। ভাষার সমস্যা অবশ্যই ছিল, তবু সামলে নেওয়া গেল।

লাঞ্চের পর মিমবেলা এসে আমার কাজ দিয়ে গেলেন, একটা পেপারও পড়তে দিলেন। আর বললেন, উনি শীগ্গীর এক মাসের জন্য ইউরোপে যাচ্ছেন। ফিরে আসার পর আমাদের ফরম্যালি কাজ শুরু হবে। আমিও ভাবলাম ভালই হ'ল। এই সুযোগে পুরনো পড়াগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। লাইব্রেরির বইগুলো দিয়েই শুরু করব।

পাঁচটা বাজল। যথাসময়ে আমিও তৈরী হয়ে নিলাম কমেরসিয়েল মেহিকানায় যাবার জন্য। প্রথমে গেলাম সিমাতেল। আংখেল বলেছিলেন, সেখান থেকেই বাস ছাড়ে। বাসকে বলা হয় 'আউতোবুস'। সেই আউতোবুসে কমেরসিয়াল মেহিকানায় পৌঁছাতে মিনিট পনেরো লেগেছিল। কমেরসিয়াল মেহিকানা হ'ল ওয়ালমার্টের মতো। ছাতা, খাতা, কলা, বিস্কুট সবই কিনেছিলাম। রাতে ডিনারের বন্দোবস্ত ছিল না; তাই এসব খেয়েই রাত কাটাতে হবে। ফেরবার সময় হাতে জিনিস থাকায় ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সি আমাকে ইগলেসিয়া দে ভ্যালেন্সিয়ানায় (সিমাতেলের কাছের সেই চার্চ, যার ঘন্টাধ্বনিতে সকালে ঘুম ভেঙেছিল) নামিয়ে দিল। আমি ঠিকঠাক জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলাম, 'কুয়ানতো' – মানে 'কত?' আর ট্যাক্সি ড্রাইভার যখন বলেছিল 'ভেইনতিসিংকো', তখন আমার বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হয়নি যে ওটা 'পঁচিশ'। সিমাতেলে এসে ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করে নিলাম। শেষ হ'ল আমার সিমাতের প্রথম দিন।

||৩||

মিমবেলা চলে গেলেন ইউরোপে। আমি নিজেই এবার আমার সময়ের মালিক। ঠিক করে ফেললাম উনি ফেরবার আগে এই এক মাস ভাল করে কাজ গুছিয়ে রাখতে হবে। উনি যে বইটা আমাকে পড়তে বলে গিয়েছিলেন, সেটা আমি ইন্ডিয়া থেকে জেরক্স করিয়ে এনেছিলাম; পড়তে শুরু করলাম।

কমেরসিয়েল মেহিকানা থেকে কিছু খাতা কিনে এনেছিলাম, সঙ্গে একটা অ্যালার্ম ক্লক। অনেক বই নিলাম লাইব্রেরি থেকে। জোরদার নোটস লেখা শুরু হ'ল। এইভাবে লেখাপড়া আর খাওয়াদাওয়া নিয়ে দিন পঁচিশেক সিমাতেলে কাটানোর পর আমি একটা অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ পেয়ে গেলাম। আংখেলই আনলেন অ্যাপার্টমেন্টের খবর। গোটা দুই তিন বাড়ি দেখবার পর এই বাড়িখানা আমার পছন্দ হ'ল। এই বাড়িতে লোপা আসবে, আমার ভাবী সন্তান আসবে, বাড়িখানা মনমতো হওয়া চাই বৈকি! পুরোপুরি ফার্নিশড বাড়ি; দুটো ঘর – একটা বসার ঘর আর একটা শোবার ঘর, দুখানা ঘরই বেশ বড়। এছাড়া রান্নাঘর। রান্নাঘর আর বসার ঘরের মধ্যে পার্টিশন একখানা উঁচু টেবিল মতো জায়গা, যার ধারে চেয়ার রেখে অনায়াসে ডাইনিং টেবল বানিয়ে বসে খাওয়া যায়। আমি উইকেন্ডে শিফট করলাম তাই জিনিসপত্র কিনে আনার সুবিধে হ'ল।

কমেরসিয়েল মেহিকানা থেকে বেরিয়ে একটু সামনে এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরলে টানা রাস্তা, সেখানে হরেক রকমের দোকান। সেখানেই দেলসোল চোখে পড়ল। এটি মেক্সিকোর অন্যতম চেন দোকান। এখান থেকেই কিনলাম বিছানার চাদর, বালিশ, তোশক, বেডকভার। তা ছাড়া কমেরসিয়েল মেহিকানা থেকে বাড়িতে রান্নাবান্না করবার জন্য কিছু খাবারদাবার। আর মাত্র কয়েকটা মাস। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের ছুটি পড়লেই লোপাকে নিয়ে আসব। এই ক'টা মাস ঠিকঠাক কেটে যাক, আমি নিজের কাজে ঠিকমতো এগোই, আমাদের বাচ্চার ঠিকঠাক জন্ম হয়ে যাক! সব ভালয় ভালয় মিটলে লোপার এখানে আসাটা শুধু সময়ের প্রতীক্ষা।

এবারে রান্নাবান্নার কথা একটু বলি। সেই রান্নাবান্না, যা আমি এতদিন শুধু লোকজনকেই করতে দেখেছি, নিজে কোনদিনও করিনি। ইন্ডিয়ার মতো এখানেও গ্যাস সিস্টেম; তাই এখানেও সিলিন্ডারের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমার বাড়িওয়ালা, লুই পাবলো কাস্ত্রো বললেন যে এখানে দুটো গ্যাসের কম্পানি আছে, তারা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে সোম, বুধ, আর শুক্রবার। গ্যাস ফুরিয়ে গেলে ওদের ডেকে আনতে হয়। তারা নতুন সিলিন্ডার লাগিয়ে দিয়ে পুরনো সিলিন্ডার নিয়ে চলে যায়। এ ছাড়া আবর্জনার গাড়ির কথাও বললেন। মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, আর শনিবার অর্থাৎ ওঁর ভাষায় 'টিউসডে', 'থুরসডে' আর 'স্যাটুরডে' – এই তিনদিন গাড়ি আসবে। যেহেতু উইকডেতে আমি থাকব সিমাতে, তাই শনিবারই আমার ভরসা। মিঃ কাস্ত্রোর কথামতো আমি শনিবার ময়লার ব্যাগ রেডি করে অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর গাড়ি যখন এল, আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে। কী বলব, বুঝতে পারিনি। ময়লা-গাড়ির ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'বাসুরা'?' আমি বুঝলাম ময়লার কথাই বলা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ময়লার ব্যাগ ওকে ধরিয়ে দিলাম। বুঝতে পারার আরও একটা কারণ হ'ল আগের বছর মুম্বাইতে থেকে জেনেছিলাম সেখানে ময়লাকে বলে 'কাচরা'। 'কাচরা' আর 'বাসুরা' এই দুটো শব্দের মধ্যে মিলও আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। আগের বছর মুম্বাই আর এ বছর মেক্সিকো – দু জায়গায় থাকার মধ্য দিয়ে আমার ভোক্যাবুলারিতে অনেক শব্দ যোগ হয়ে গেল।

সোমবারই গ্যাস সিলিন্ডার জুটে গিয়েছিল। 'গ্যাস বুতানো' কম্পানির গ্যাস সিলিন্ডার নিয়েছিলাম আমি। প্রথমদিন খিচুড়ি আর ফুলকপি বানাবার চেষ্টা করেছিলাম। এখানে তো আর মুগ বা মুসুর ডাল নেই, তাই যে লেন্টিল পাওয়া যায় সেই দিয়েই এই খিচুড়ি। বোধহয় লেন্টিল ভিজিয়ে রাখলে ভাল হতো; কিন্তু আমি জানতাম না, আর মাথায়ও খেলেনি, তাই একটু শক্ত শক্ত খিচুড়িই খেলাম। এখানে হলুদও পাওয়া যায় না, তাই কমলা রঙের একটি মশলা দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করলাম। ফুলকপি কিনেছিলাম রাঁধব বলে; কিন্তু গ্যাসের চুলোকে কী করে কমাতে বাড়াতে হয়, বুঝলাম না। ইন্ডিয়াতে গ্যাসের চুলোয় দেখেছিলাম মাঝখানে মানে ম্যাক্সিমাম, একধারে নিলে অফ আর অন্যধারে নিলে সীম, কিন্তু সীম করবার কোনো উপায়ই এখানে বুঝলাম না। দুই এক্সট্রিমের মাঝখানে পড়ে আমার যা অবস্থা হ'ল তাতে আধ-সেদ্ধ অথচ পোড়া ফুলকপিই খেতে হ'ল। এরপর থেকে আমি ঠিক করলাম, ফুলকপি কুকারে বানিয়ে নেব। তাই যেদিন কুকারে খিচুড়ি হবে, সেদিন ফুলকপি না বানিয়ে অন্য কোনো সবজি বানাতে হবে। চাল আর ব্ল্যাক বীনস দিয়েও খিচুড়ি বানাতাম – মনে আছে। ব্ল্যাক বীনস যে ভিজিয়ে রাখার ব্যাপার আছে, সেটা জানা ছিল না; তবু দু-তিনটে সিটিতে যে খিচুড়ি হতো, সেটা সম্পূর্ণ ভুল একটা প্রিপারেশন হলেও খেতে খারাপ লাগত না। তাই নিয়মিত কুকার ব্যবহার করে রাত্তিরে রান্নাবান্নার পাট শেষ অবধি

বজায় রাখতে পেরেছিলাম। রান্না করবার সময় যদি কখনো মিঃ কাস্ত্রো চলে আসতেন, আর কুকারে সিটি উঠত,তখন ভদ্রলোক ভয়ে দু'কানে আঙ্গুল দিতেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এই সিটি কী এমন, যে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে! একটা মজার জিনিস – ভদ্রলোক না পারলেও প্রচন্ডভাবে চেষ্টা করেন আমার সাথে ইংরেজি বলবার। আর যখনই শব্দ খুঁজে পান না, তখনই চারদিকে তুড়ি মেরে মেরে মনে করবার চেষ্টা করেন। যেন বাতাস থেকে শব্দ পেড়ে আনছেন! তখন হাসিও পেত, কষ্টও হতো! জেনেছিলাম এখানে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ইংরেজি পড়তে হয়, তারপর আর দরকার নেই। সেজন্যই রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে স্প্যানিশ না-জানা মানুষের কথাবার্তা বলা এত কষ্টকর। ভদ্রলোকের দুটো কুকুর ছিল, একটা বাড়ির সামনে আর একটা পেছনে থাকত। সামনে থেকে পেছনে যাওয়ার কোনো সোজাসুজি উপায় ছিল না, তবু ওরা দুজনে কম্যুনিকেট করত। যেমন – 'গ্যাস এক্সপ্রেস' যখন লোকজনকে গ্যাস দিতে আসত, তারা জোরে জোরে হর্ন দিত আর মাইকে লোককে ডাকত গ্যাস নেওয়ার জন্যে। সেই শুনে এক কুকুর ডেকে উঠলে অন্যটিও যোগ দিত সেই ডাকে!

আস্তে আস্তে অ্যাপার্টমেন্টের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। মিমবেলার ফেরবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। অ্যাপার্টমেন্টে এসেও আমার পড়াশুনোর রুটিন মোটামুটি একইভাবে চলছিল। সকালবেলা চটপট চান করে তৈরী হয়ে সিমাতেলে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করা, সেখান থেকে হেঁটে সিমাত যাওয়া, সেখানে বসে পড়াশুনো করা, নোটস বানানো, লাঞ্চের সময় আবার সিমাতেলে এসে খাওয়াদাওয়া করা, আবার সিমাতে ফিরে এসে কাজকর্ম করা, দরকার হলে লাইব্রেরী থেকে আরও আরও বই নেওয়া। তারপর বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা বাজলে বাসে করে বাড়ি এসে ফল-টল খেয়ে চান করে রান্নাবান্নার জোগাড়যন্ত্র করা। রান্নাবান্না বলতে ওই ভুল পদগুলো দিনের পর দিন ধরে রান্না করে যাওয়া। হাজার হোক এই ভুল খাবারগুলো আমার খিদে তো মিটিয়ে দিত! আর এই ভুল খাবারগুলো আমাকে অতগুলো মাস মোটামুটি সুস্থ শরীরে বাঁচিয়েও তো রেখেছিল! হ্যাঁ, পরে আমার ওজন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ির খাবার খেয়ে নয়, বোধহয় সিমাতেলের খাবারের জন্য। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ সিমাতেলে করলেও রাতের খাওয়াটা বাড়িতেই করতাম। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে আমি বসে যেতাম নোটস বানাতে। প্রায় চার-পাঁচ সপ্তাহ ধরে নোটস বানিয়ে বানিয়ে আমার এন্টারটেইনমেন্ট বলতে কিছুই ছিল না। সিমাতে একটুখানি ইন্টারনেট দেখা আর ক্রিকেটের স্কোরগুলো জানা আর উইকেন্ডে, বিশেষ করে রোববার, কমেরসিয়েল মেহিকানায় গেলে বাজার করবার আগে কোনো সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ নেট সার্ফিং করা, লোপাকে, মাকে ইমেল লেখা – মনে হচ্ছিল এছাড়াও আরো কিছু করা দরকার যাতে মনটা কিছুক্ষণের জন্য একটু পাখা মেলে ওড়বার সুযোগ পায়। এরপর কোনো এক রবিবার সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে আমি কুমার শানুর একটি ইয়াহু গ্রুপ আবিষ্কার করলাম এবং তাতে মেম্বার হলাম। ইতিমধ্যে মিমবেলা ফিরে এলেন। ওঁর সঙ্গে ডিসকাশন শুরু হ'ল। তার জন্য বেশ কিছু বই, বেশ কিছু পেপার জেরক্স করাতে হল। এবারে পুরনো নোটস বানানোর পরিবর্তে এই নতুন বই ও পেপার থেকে নোটস বানানো শুরু হ'ল, সঙ্গে প্রবলেম নিয়ে চিন্তাভাবনা। জিনিসটা যেহেতু আমার কাছে নতুন, আমি কীভাবে এগোব, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মিমবেলার কাছে গেলে উনি একটুখানি ইঙ্গিত দিতেন, সেটাই ছিল আমার জন্য যথেষ্ট। এর পরের দুদিনে আমি কাজ করে পুরোটা প্রমাণ করে ফেললাম। মন ভরে উঠল আত্মপ্রসাদে। মনে হ'ল পেপারের অর্ধেকটা কাজ হয়েই গেল। এবারে বাকি পার্টটুকু নিয়ে কিছু করতে পারলে আর দেখতে হবে না! একটা পেপার অনায়াসে হয়ে যাবে।

কিন্তু একদিন গেল, দুদিন গেল, বুঝলাম না কীভাবে হতে পারে জিনিসটা। নানা রকম পেপার জেরক্স করলাম, লাইব্রেরি থেকে আরও বই নিলাম। নিজেও লিখে গেলাম পাতার পর পাতা, কিছুতেই যেন কিছু হয় না। মিমবেলার কাছে গেলেও ঠিক কোনো আইডিয়া পাওয়া যায় না। উনিও শুধু এই বই, সেই বই বলেন। একবার উনি আমাকে একখানা বই দিলেন পড়তে – ওঁর নিজেরই বই । তারপর বললেন – পড়া হয়ে গেলে নীচে ওঁর মেলবক্সে রেখে দিতে। মজার ব্যাপার হ'ল – ওঁর ঘর আমার ঘর থেকে মাত্র কয়েকটি ঘর পরে। উনি ঘরে থাকলে অনায়াসে বইটা ওঁকে দিয়ে আসা যায়। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র।

সেখানে অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে নীচের মেলবক্সে রাখতে যেতে হবে! হ্যাঁ, এক্সারসাইজের জন্য ঠিক আছে। এই গুয়ানাখুয়াতো শহর এক পাহাড়ি শহর, এখানে এই সিমাত বিল্ডিং থেকে অনেক ভাবেই বেরনো যায় – সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে নীচু ফ্লোর – দু দিক দিয়েই রাস্তায় পড়বার উপায় রয়েছে। সেসব কারণেই বোধহয় এই বিল্ডিঙে কোনো এলিভেটর নেই। তাই সবচেয়ে উঁচু ফ্লোর থেকে সবচেয়ে নীচু ফ্লোরে ওঠা-নামা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তা সত্ত্বেও মিমবেলো যখন বলছেন, তখন বোঝা যায় উনি চান না ওঁর ঘরে যখন তখন যাই।

এদিকে লোপাকে নিয়েও আমার ভাবনা বেড়ে গেল। লোপাকে আমি সপ্তাহে দুবার ফোন করলেও প্রায় রোজই ইমেল লেখার চেষ্টা করতাম। ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে ভাল লাগত, কিন্তু ভয়ও হতো। ভাল লাগত কারণ এই দূরদেশে যেখানে সামান্য বাংলা বা হিন্দী বলবার সুযোগ নেই, একজন ভারতীয়ও নেই আশেপাশে, তখন এই মেসেজগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। একদিন ওকে আমি লিখেছিলাম যে আমি এখানে একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আবিষ্কার করেছি। সিমাতেলে দুপুর দুটোয় লাঞ্চ করা সত্ত্বেও আবার বিকেল ছ'টায় পেট ভরে ভারতীয় খাবার খেতে আমার একটুও অসুবিধে হতো না। হোক না স্টাফরা মেক্সিকান, খাবারটা তো ভারতীয় স্বাদের! লোপা এসব জেনে বলল ওর চোখে জল এসে গেছে একথা শুনে। আমি যেন এরপর যখন ইচ্ছে হয়, তখনই ওখানে গিয়ে খেয়ে আসি। এ ধরনের ইমেলগুলো আমার জন্য সত্যিই অনেক আনন্দদায়ক ছিল। কিন্তু তার থেকেও বেশী মূল্যবান ছিল লোপার ভাল থাকা। তাই ভয় হতো। ভয় হতো কারণ লোপার বাবা-মা'র বাড়ি শিলচরে অম্বিকাপট্টিতে এক টিলার ওপর, যার নাম কলেজ টিলা। আমাকে ইমেল লিখতে হলে ওকে সেই টিলা ভেঙে ওঠানামা করতে হয়। এদিকে অগাস্ট মাস এসে গেছে। আমাদের সন্তানের জন্মের দিন এগিয়ে আসছে। এই যাওয়া-আসার কারণে শেষে কোনো অনর্থ না ঘটে!

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করছিলাম তাই হ'ল। ডাক্তার লোপাকে কমপ্লিট বেডরেস্টে থাকার আদেশ দিলেন। এমনিতে আমি লোপাকে নিয়ে অত চিন্তা করছিলাম না। ভাবছিলাম বাবা-মা'র কাছে আছে, ভালই থাকবে। কিন্তু বেডরেস্টের কথা শুনে সত্যিই ভয় ঢুকে গেল। লোপা ঠিক থাকবে তো? বাচ্চাটার ঠিকমতো ডেলিভারি হবে তো? ডেলিভারির পর লোপা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে তো?

শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে ছাড়াই লোপার ডেলিভারি হয়ে গেল – আমাদের সবার সৌভাগ্য! ভালয় ভালয় মিটল সব, ঠাকুরের অশেষ কৃপা! স্বদীপ্তর দু'মাস বয়সের ফটো লোপা আমাকে পাঠিয়েছিল। যেন ঠিক ছোটবেলার আমি! দেখে মনে হ'ল – এই শিশুটি তার বাবার থেকে কত দূরে নিজের দাদু-দিদার আশ্রয়ে থেকে মানুষ হচ্ছে! জানেও না যে সে তার বাবাকে জন্মের সময় দেখেনি। এও জানে না কবে সে তার বাবাকে দেখবে। ভাবতে ভাবতে অসহায় শিশুটির জন্য বুকে মোচড় দিয়ে উঠত।

||৪||

স্বদীপ্তর জন্মের পর আমার মনের দুশ্চিন্তাও দূর হ'ল। কিন্তু আমার কাজের সেই সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থেকে গেল। প্রবলেমের বাকিটা আর যেন কোনোমতেই মিটতে চায় না। আমিও আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়ি কুমার শানু গ্রুপে। অনেকটা সময় আমার সেই গ্রুপে কেটে যেতে লাগল। শুধুমাত্র প্রবলেমটা মেটাতে না পারার জন্যই যে পড়াশুনো থেকে মন উঠে গিয়েছিল, তা নয়। আরও একটা বড় কারণ ছিল, আশা করেছিলাম লোপা আর ছেলেকে ডিসেম্বরে আমার কাছে নিয়ে আসব। কিন্তু আসতে হলে ছেলের পাসপোর্ট চাই, পাসপোর্ট করাতে হলে বার্থ সার্টিফিকেট চাই। সেই বার্থ সার্টিফিকেটই হয়ে উঠছিল না। আমার শ্বশুরমশাই এত চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শিলচর মিউনিসিপ্যালিটি ওঁকে অসুবিধেয় ফেলতে ছাড়েনি। এসবের জন্য ধীরে ধীরে বুঝতে পেরে গেলাম যে লোপাদের ডিসেম্বরে আনবার স্বপ্ন আমার অপূর্ণই থেকে যাবে। এ-কারণেও পড়াশুনোয় মন বসাতে পারিনি।

ইতিমধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। অক্টোবর মাসের শেষ সোমবার ছিল সেটা। সাধারণতঃ আমি আর আরোলদো একসঙ্গে খেতে যাই। কিন্তু উইকেন্ড ছিল বলে ও কোথাও গিয়েছিল, সোমবারেও ফেরেনি। দুটো বাজলে, অর্থাৎ লাঞ্চের সময় আমি একাই সিমাতেলে গেলাম লাঞ্চ খেতে। যখন পৌঁছোলাম – দেখলাম কেউই নেই ক্যাফেটেরিয়ায়।

ভাবছি থাকব না চলে যাব, কিন্তু এতটা রাস্তা হেঁটে এসেছি, দেখাই যাক না! স্টাফরা আমাকে অবাক হয়ে দেখল। হেড কুকও অবাক মুখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কী খাব, আমি জানালাম। খাবার তৈরী ছিল, সার্ভ করে দিতে আমি চটপট খেয়ে নিয়ে আবার সিমাতে ফিরে গেলাম। পরদিন মঙ্গলবার। আরোলদো ফিরে এসেছে। দুটো বাজবার পাঁচ মিনিট আগে আমি ওকে বললাম খেতে যাবে নাকি। ও একবার ঘড়ি দেখল, আমাকেও দেখাল, দেখলাম একটা বাজতে পাঁচ। ও বলল আরও ঘন্টা খানেক বাদে যাবে, এখন তো সবে একটা। আমি অবাক হয়ে আমার ঘড়ি দেখলাম। তখনই প্রথম ওর কাছ থেকে জানলাম কীভাবে আমেরিকা-মেক্সিকোসহ পৃথিবীর বেশ কিছু সংখ্যক দেশে সময় এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়, বলা হয় 'ডেলাইট সেভিং টাইম'। সেটি হয় অক্টোবরের শেষ রবিবারে। সময় আবার মার্চের শেষ সপ্তাহে এগোবে। সত্যিই আশ্চর্য হলাম, আমার এত আমেরিকান কানেকশন, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাকে কেউ কখনও বলেনি? সত্যিই খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, সন্দেহ নেই! আরও কত কিছু জানব কে জানে?

অনেকদিন ধরেই আমার পড়ানোর শখ। মিমবেলাকে বললামও সে কথা। জিজ্ঞেসও করে ফেললাম স্প্রিং সেমিস্টারে পড়াতে দেবে কিনা। অথচ পড়াতে হলে তো স্প্যানিশ জানতে হবে! কোথায় শিখব স্প্যানিশ? ভামবোয়ানীর কাছে চারদিনের লেসনে তো বিশেষ লাভ হয়নি! এরপর খবর নিয়ে জানা গেল ইউনিভার্সিটি অফ গুয়ানাখুয়াতোতে এক মাসের ক্র্যাশ কোর্স করা যেতে পারে। ভর্তি হলাম সেই কোর্সে। রিডিং, গ্রামার আর স্পিকিং – তিনটে পিরিয়ড ছিল। স্প্যানিশ শিখতে গিয়ে জানলাম স্প্যানিশেও হিন্দীর মতো লিঙ্গ বিশেষে সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপ বদলে যায়। আর শুধু পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গতেই নয়, ক্লীবলিঙ্গতেও হিন্দীর মতো পুরুষ-স্ত্রী ভেদ রয়েছে। আরেকটা মিল হ'ল – যেমন বানান তেমনি উচ্চারণ। গ্রামার ক্লাসে জানলাম স্প্যানিশে বারো রকমের টেন্স। সব মিলিয়ে বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তবু ভালই উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছিলাম মনে হয়। কারণ যখন রেজাল্ট বেরিয়েছিল, আমি রিডিং-এ এ-মাইনাস আর বাকি দুটোতে এ-প্লাস পেয়েছিলাম।

আমার ইন্ডিয়ায় যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যাওয়াতে মাঝে মাঝে কোনো দুর্বল মুহূর্তে মনে হতো আদৌ আর কোনদিন যেতে পারব তো? এ তো সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। কাউকে যদি বলা হয় এখানেই সারা জীবন থেকে যেতে, তো সে কীভাবে নিজের পূর্ব জীবনের সবকিছু ভুলে নিজেকে এই জগতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে? কীভাবে এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবকিছুকে আপন করে নেবে? আমাকে যদি কেউ তা করতে বলে, আমি কি পারব? ভাবতে ভাবতে মন আরও খারাপ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে কোনো মেক্সিকান ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আমি আমার ভারতের ছেলে বা মেয়েকে যেন খুঁজবার চেষ্টা করতাম। কাউকে কাউকে দেখলে সত্যিই মনে হতো – ঠিক যেন ভারতীয়, ভাষাটাই কেবল স্প্যানিশ!

অবশেষে বহুবার শ্বশুরমশাইকে ঘোরানোর পর মিউনিসিপ্যালিটি করে দিয়েছিল বার্থ সার্টিফিকেট। এরপর পাসপোর্টের জন্য বাবা হিসেবে আমারও ভূমিকা ছিল। এর জন্য ভারতীয় এমব্যাসিতে যাওয়ার দরকার ছিল। নিকটতম ভারতীয় এমব্যাসি বলতে মেক্সিকো সিটি। আগের দিন গুয়ানাখুয়াতো থেকে বাসে চেপে সেখানে পৌঁছে আই এস আই-তে আমার এক বছর সিনিয়র শ্যামল কুমারের বাড়িতে উঠলাম এবং পরদিন গেলাম এমব্যাসিতে। কাজকর্ম মিটিয়ে লাঞ্চ সেরে শ্যামলকে টা-টা বলে আমি আবার ফেরার বাসে চড়ে বসলাম – মেক্সিকো সিটি থেকে গুয়ানাখুয়াতো।

গোবিন্দন ছিল আমি ছাড়া সিমাতের অপর ভারতীয়। গোটা গুয়ানাখুয়াতোতে এছাড়া আর কোনো ভারতীয় আমার চোখে পড়েনি। গোবিন্দন ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করেছিল আমি জয়েন করবার দু'মাসের মধ্যে। মাঝে মাঝে আমি আর ও একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে যেতাম। ও বেশী খেতে পারত না। আমার খাওয়া দেখে গোবিন্দন বলত, "ইউ ইট আ লট ম্যান!" কিন্তু মাঝে মাঝে আমারও বেশী মনে হতো।

একবার খুবই আশ্চর্জনক একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওড়িশি নাচের একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল এই গুয়ানাখুয়াতোতে। গোবিন্দন আর আমি দুজনেই দেখতে গিয়েছিলাম। এক মেক্সিকান মেয়ে ভারতীয় সাজে সেজে, শাড়ি পরে, কপালে টিপ পরে এসে স্প্যানিশে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিল। দেখে বেশ লেগেছিল। গোবিন্দনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল। ও মুম্বাই আই

আই টি থেকে পিএইচডি করেছে, ওর বিষয়বস্তু ছিল স্টোকাস্টিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওর ঘরে আমি অত যেতাম না, শানু গ্রুপ নিয়েই মেতে ছিলাম। কিন্তু এরপর যখন মিমবেলার দেওয়া প্রবলেমটার সমাধান করতে না পারার জন্য এক্সটেনশন না হবার সম্ভাবনা সামনে এল, তখন কাজকর্ম করা, গ্রুপে পার্টিসিপেট করা, ক্রিকেট – এসব সত্ত্বেও মনে হ'ল আরও কিছু চাই। তখনই আমি ফাঁক বুঝে চলে যেতাম গোবিন্দনের ঘরে। ও ছিল কিশোরের ফ্যান, কিশোরের গানের কথা বলত। মাঝে মাঝে 'রাগা-ডট-কম' ওয়েবসাইটে কিশোর কুমারের গানও বাজাত। এক উইকেন্ডে ওর বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করল। আমি ওর বাড়ির টিভিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'মিঃ নটবরলাল' ছবিটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

||৫||

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করেছিলাম, তাই হ'ল, আমার এক্সটেনশন হ'ল না। আমি সিমাতের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম। উনি আমাকে মেক্সিকোর দক্ষিণে ক্যানকুনের কাছাকাছি একটি জায়গার কথা বললেন। শহরের নাম মেরিদা – রাজ্যের নাম ইউকাতান পেনিনসুলা। ইউনিভার্সিটির নাম উয়াদী ইউনিভার্সিদাদ আউতোনোমা দে ইউকাতান। সেখানে আমাকে সিমাতের ডিরেক্টর রেকমেন্ড করে দিলেন। উয়াদীতে আমার চাকরি হয়ে গেল। অগাস্টে জয়েন করতে হবে। এই প্রথম আমি পড়াব। উয়াদীর চাকরির সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেললাম ইন্ডিয়ায় যাব। এখানে আমারই বয়সী ফ্যাকাল্টি, এফরেন মোরালেস আমায়া, যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, ওকে জিজ্ঞেস করলাম কোথা থেকে বাজার করব। প্রথমবার বিদেশ থেকে দেশে গেলে সবাই নানান উপহার নিয়ে যায়। আমিও তাই করব। এফরেন বলল, ও শীগ্গীরিই পুরো ফ্যামিলি নিয়ে যাবে লেওনে বাজার করতে। তখন আমিও ওর সঙ্গে যেতে পারি। এফরেন কথা রেখেছিল। সত্যিই আমাকে নিয়ে গেল। আমি প্রাণভরে বাজার করলাম। নিজের পরিবার, আত্মীয়স্বজন তো বটেই, এমনকি মুম্বাই আর বি আই-এর চেনাজানা লোকেদের জন্যও বাজার করলাম। নিজের ছেলেকে প্রথম দেখব, মুম্বাই, কলকাতা, শিলচর, দিল্লী, আগ্রা – এতগুলো জায়গায় যাব। এক্সটেনশনের ব্যর্থতা ভুলে সেই আনন্দে মেতে গেলাম। শুধু আনন্দই নয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও সারতে হবে দেশে। লোপা ও স্বদীপ্তর মেক্সিকান ভিসার জন্য দিল্লীতে কিছু কাজ থাকবে। তবে ইন্ডিয়া যাবার দুদিন আগে সবচেয়ে দুঃখের কাজটি করতে হ'ল আমাকে। ছেড়ে দিতে হ'ল আমার এই অ্যাপার্টমেন্ট, যে অ্যাপার্টমেন্টে লোপা ও ছেলেকে আনবার সাধ ছিল আমার। অফিসও খালি করে দিতে হ'ল।

অবশেষে এল ইন্ডিয়া যাবার দিন। আমার এবারের রুট লেওন-মেক্সিকো সিটি-প্যারিস-মুম্বাই। প্যারিস এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমার যাত্রাপথে প্রথম এক ভারতীয়র মুখ দেখলাম। মেক্সিকোতে গোবিন্দন ছাড়া কোনো ভারতীয় দেখতে না পাওয়া আমাকে তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল। তাই প্যারিস এয়ারপোর্টে ভারতীয়দের দেখে আমি যেচে গিয়ে একজন পাগড়িধারী শিখকে হিন্দীতে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম। হিন্দী বলতেও খুবই ইচ্ছে করছিল। দুঃখের বিষয়, সেই ভদ্রলোক ইংরেজিতে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

এক মাস ভারতে কাটিয়ে এগারো মাস বয়সের ছেলেকে জীবনে প্রথমবার দেখে আবার সেই মুম্বাই-প্যারিস-মেক্সিকো সিটি-লেওন। লেওন এয়ারপোর্টে আবার সেই একই ড্রাইভার এলেন আমাকে রাইড দিয়ে সিমাতেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গত বছর যখন উনি এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে, তখন আমার মনে ছিল অ্যাকাডেমিকসে ফেরার আনন্দ। আর এবারে শুধুই হৃদয়জোড়া বিষাদ – ব্যর্থতার বিষাদ। কতদিনের জন্য এই মেরিদা – কে জানে! মেরিদা যাবার আগে ক'টা দিন সিমাতেলে থাকতে হ'ল। মিমবেলার সঙ্গে প্রবলেমটা নিয়ে একটু আধটু আলোচনা হ'ল, বিশেষ এগোল না। আমার আর মন নেই এসবে। কোনোরকমে এই ব্যর্থতার জায়গা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। হোক মেরিদা এক কম্প্রোমাইসের শহর, হোক উয়াদী এক কম্প্রোমাইসের চাকুরি ক্ষেত্র; তবু আমি এখন উয়াদীর। আমি এখন আর সিমাতের কেউ নয়। উয়াদী আমাকে ডাকছে, আমাকে যেতে হবে। দু'সপ্তাহের জন্য আমাকে একটা ছোটখাটো অফিস দেওয়া হ'ল সিমাতে। সেখানে থেকে কুমার শানু গ্রুপে লেখা, শানুর গান শোনা, আর 'বাংলালাইভ' নামে একটা বাংলা ওয়েবসাইটের 'মজলিস'-এ মাঝে মাঝে যোগদান করা। এভাবেই কাটল আমার গুয়ানাখুয়াতোর শেষ কটা দিন।

Hola México, es un gusto conocerte.

জগন্নাথের জমি

আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প অবলম্বনে

নাট্যরূপ: সুমিতা বসু

চরিত্র: তীর্থঙ্কর, শুভঙ্কর, মালিনী ও জগন্নাথ

(বসবার ঘর – রবিবারের সকাল, বর্ষাকাল, বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে | তীর্থঙ্কর টেবিলের সামনে খবরের কাগজ খুলে পড়ছে | পাশের চেয়ারে শুভঙ্করের হাতে খেলার পাতা | রেডিওতে হেমন্তর গলায় 'এই মেঘলা দিনে একলা'– মালিনী ঘরে ঢুকল, হাতে ঝাড়ন, ঘরোয়া সাধারণ সুতির শাড়ি পরে | তীর্থঙ্কর মুখ না তুলেই –)

তীর্থঙ্কর (তী) - আরেক কাপ চা পাওয়া যাবে? সেই সকালে কোনোমতে এক কাপ ঠান্ডা চা...

শুভঙ্কর (শু) - আমার চা'টাও একেবারে ঠান্ডা ছিল | এই মেঘলা দিনে হেমন্তর গানটা শুনে, বুঝলি দাদা, মনটা চা চা করে নিমন্ত্রণ চাইছে –

মালিনী (মা) - আহা, চা চা করে নিমন্ত্রণ চাইছে! তা যাও না, দুজনে ছাতা মাথায় নেমন্তন্নে! সকাল থেকে নড়বে না, কিন্তু কথার ফুলঝুরি |

শু - বৌদি, তুমিও তো আমাদের নেমন্তন্ন করতে পারো | বলো, কতদিন... হুম, কত মাস পরে একটা রোববারের খালি সকাল পাওয়া গেল! (ব্যঙ্গ করে হেসে) দাদার কোনো মক্কেল নেই!

মা - সেটা ঠিক বলেছ, শুভ | আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি | আর ওই ভাঙা গলায় 'হরি দিন তো গেল' শুনতে হবে না |

তী - তোমরা থামবে? একটা গরিব লোক, জন্মকুলে কেউ নেই, যাই হোক একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসত...

শু - থাম তো দাদা | তোর বরাবরের এই ন্যাকামিগুলো আর ভাল লাগে না! গত তিন মাস ধরে কোথাকার কোন উটকো লোকের জন্য প্রতি রোববার সকাল থেকে ছাতার মাথা চলেছে! Will – ওরে বাব্বা!

মা - আমিও তোমার সঙ্গে একমত | আজ যখন ফাঁকা পাওয়া গেছে, এখন দুজনে উঠে একটু বাজারে যাও তো, শুনেছি ইলিশ উঠেছে খুব!

তী - (হাই তুলতে তুলতে) চা না পেলে আমি আরও একটু ঘুমোব | কী সব ইলিশ টিলিশ, শুভ তুই যা... তুই ভাল দর করতে পারিস |

শু - এই দাদা, দ্যাখ দ্যাখ, মঙ্গলবার মোহনবাগানের খেলা আছে, যাবি? তাহলে দুটো টিকিট কাটতে বলি?

মা - উফ, তোমাদের দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়! আজ মেনুতে লুচি আর আলু ছেঁচকি | প্রতি রোববার পাঁউরুটি আর মুড়ি খেতে খেতে অতিষ্ঠ!

তী - তা ম্যাডাম, আজ মন এত খুশি খুশি – প্রসন্ন কেন, লুচির occasion-টা কী?

মা - কারণ, তোমার ওই উইল শেষের জন্য celebration! মাগো কী নোংরা দেখতে লোকটাকে, মাথা ধরে যায় দেখলেই!

তী - চুপ করো | গরিব মানুষ... খুব সরল কিন্তু |

শু - থাম তো দাদা, গরিব! সরল! তা গুরু, শুধু তোকেই ধরল কেন? পাকড়াক না আর কাউকে | মাইরি বলছি, কেউ ওকে পাত্তা দেবে না, তুই ছাড়া | আমার কথা একেবারে point-এ point-এ মিলিয়ে নিস...

মা - ঠিক বলেছ | তোমার দাদা নাকি কাউকে 'না' বলতে পারে না | যত জ্বালা আমার...

তী - আঃ! মালিনী তুমি থামবে?

শু - পড়ত আমার হাতে, এক্কেবারে টিট করে দিতাম | আবার এসেই – 'উকিলবাবু, একটু জল দেবেন, চা দেবেন?'

মা - আবার মুড়িও চাই | দেখেছ শুভ, একটাও মুড়ি পড়ে গেলে টেবিলের তলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে খাবে |

তী - তোমরা থামো | কতদূর থেকে হেঁটে আসে – তাছাড়া, তোমরা এত ছোট করছ কেন নিজেদের? কেন?

মা - তোমার আস্কারাতেই আজ তিন মাস প্রতি রোববার এটা চলছে! কতদিন কোথাও বেরোইনি বলো তো? আর আসে তো আসে একেবারে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে টানা দুপুর পর্যন্ত! পারি না বাবা...

তী - আর তোমায় পারতে হবে না – গত রোববারই সেসব চুকে গেছে! এত খোঁটা দেবার কীই বা আছে? সামান্য চা মুড়ি...

মা - খোঁটা? আমাদের তুমি ঘরে অব্দি ঢুকতে দিতে না – কিনা, উইল হচ্ছে আর পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে আবার হচ্ছে!

শু - ঠিক বলেছ বৌদি | না জানি কোথাকার জমিদার – শালা (ভেঙ্গিয়ে)

'হরি দিন তো গেল,' ও শালা পার আর হ'ল না! হরি ওকে বেমালুম ভুলে গেছে...

তী - শুভ মুখ সামলা! আর মালিনী তুমিও ওর সঙ্গে তাল মেলাচ্ছ! ভাল লাগে না – তোমাদের এত মাথা ব্যথা!

মা - মাথা ব্যথা এই জন্যে যে আমার জীবন থেকে তিন তিনটে মাস তুমি তেনার চরণে নিবেদন করলে।

শু - শোন দাদা, বৌদি ঠিকই বলেছে। ও তোর ঘাড়ে ভূতের মতো চেপেছে।

তী - যা তা বলিস না। কীসের ভূত!

শু - তুই তো ওঝায় রাজি নোস্। একবার আমার হাতে ছেড়ে দে – মাইরি বলছি, দেখিয়ে দেব ভূত ছাড়াতে পারি কিনা, একেবারে শালাকে ভোলাপুরের রাস্তা ভুলিয়ে দেব। উকিলবাবু, (ভেঙ্গিয়ে) উকিলবাবু...

তী - অনেকবার বলেছি, আমি উকিলবাবু নই, court-এ কাজ করি মাত্র, কিন্তু ও কিছুতেই মানবে না।

(বাইরে দূর থেকে ভেসে এল... ও হরি দিন তো গেল/ সন্ধ্যে হ'ল পার করো আমারে... আওয়াজটা ক্রমশ কাছে আসছে, উকিলবাবু ও উকিলবাবু বাড়ি আছেন তো!)

মা - (চমকে) একী, এ তো ওরই গলা, তুমি যে বললে সব উইল পাকা হয়ে গেছে, আর আসবে না!

শু - আবার এসেছে শালা।

মা - তাড়াতাড়ি ওকে বিদায় করো আর শোনো, ও যেন এই সোফায় না বসে।

শু - আবার কী চায় রে? আজই ওর মাথা ভাঙব।

তী - শুভ, এক্কেবারে না। যা যা, ভেতরে যা। তুমিও যাও। (চেঁচিয়ে) কী হ'ল জগন্নাথ, আবার কী হ'ল?

জগন্নাথ (জ) - (হাঁফাতে হাঁফাতে) উকিলবাবু একটু দেখা করতে এলুম। রোববার হলেই আপনার কথা মনে হয়। তাছাড়া আর একটু কাজ বাকি। আজ যা মেঘলা হয়ে আছে না – এখনই নামবে মনে হয়। আমার ওই ছাতাটা আবার ভাইঙ্গে গেছে, তাই ছুটে ছুটে আসতেছি...

তী - এসো এসো, ভেতরে এসো – কিন্তু কাজ বাকি কীসের, গত রোববারই তো সব পাকাপাকি হয়ে গেল, আবার কী ব্যাপার...

জ - ঠিকই, ঠিকই বলেছেন উকিলবাবু। ওই যে আপনি গত হপ্তায় বলেছিলেন না... 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'– ঠিক সেই রকম কতা!

তী - মানে? কোনটা শেষ হয়নি? তুমি নিজে সব শুনে টিপছাপ দিয়ে গেলে, আমি গুছিয়ে তুলে রাখলাম।

জ - ঠিকই... ঠিকই কইছেন উকিলবাবু। আপনার কথার কোনো নড়চড় হওয়ার উপায় আছে? তবে আজ্ঞে, ওটা শেষ হয়েও হয়নি। দাঁড়ান, দাঁড়ান, এট্টু বসে নিই... সব কইচি।

তী - হয়েছে আবার হয়নি? কী যা তা বলছ! ইয়ার্কি হচ্ছে?

জ - আসলে কাজটা মনমতো না হলে আমার আবার রেতে ঘুমটুকুও হয় না। বিশ্বাস করেন – এই আপনার পা ছুঁয়ে বলচি।

তী - আঃ, করো কি! বলেছি না আমি এসব প্রণাম-টনামে বিশ্বাস করি না। কাজের কথায় এসো – আবার কী হ'ল, কীসের মনমতো?

জ - এট্টু জল দিতে কইবেন উকিলবাবু? অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে আসতেচি, সেই কোন ভোরে বের হইচি। তবু আজ তেমন গরম নেই – মেঘ মেঘ হয়ে আচে তো!

তী - বসো; না না সোফায় নয়, ওই টুলটা টেনে নাও। (চেঁচিয়ে) একটু জল আর চা-মুড়ি পাঠিয়ে দাও তো।

জ - কী কইরে জানলেন একটু চা-মুড়ি চাই আমার? উকিলবাবু, আপনি অন্তর্যামী দেবতা। কত বড় কুলে আপনার জন্ম – আপনি তো আর পেন্নাম নেবেন না, তাই এই দু'হাত তুলে – আহা! দিঘ্যজীবী হোন!

তী - কাজের কথায় এসো জগন্নাথ। এতদিনে চার-চারটা উইল করা, আর পাল্টানো হ'ল – আবার কী চাও?

জ - ইয়ে, মানে দরকারটা খু-ব গুরুতর। রাগ কইরবেন না উকিলবাবু, গত হপ্তার উইলটা বদলানো দরকার।

তী - (আর্তনাদ) আবার! তুমি যে বললে এইটা পাকা – আপনি রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন।

জ - হ্যাঁ হ্যাঁ, বললুম তো। ওই রেজি করার সব কথা তো গেল হপ্তায় পাকা হয়ে গেল – কিন্তু জানেন কি উকিলবাবু, আমার তো আর সাতকুলে কেউ কোথাও নেই – জমিখান যখন সৎকাজেই লাগাব ঠিক করেচি...

তী - তোমাকে বারবার বলি 'উকিলবাবু উকিলবাবু' না করতে, আমি উকিল নই, court-এ কাজ করি মাত্র...

জ - কী যে বলেন! আমি আপনাকে ফী দিতে পাইরব না বলে

ছেলোনা করচেন? না না, আমারে আপনি ওসব বুঝিয়ে, ভুলিয়ে ঠকাতে পাইরবেন না।

মা - এই যে, চা আর মুড়ি। শোনো, তুমি কি একটু ভেতরে আসবে? শুভ আর আমি জলখাবার নিয়ে অপেক্ষা করছি...

তী - না, তা কী করে হয়? আমাকে বরং এখানেই...

জ - কেনে কেনে, যান না উকিলবাবু, একটু ভালমন্দ মুখে দিয়ে আসেন, আমি বসে আচি, আমার কোনো তাড়া নাই।

তী - না না, তা হয় না। মালিনী, আমাকে একটু চা আর বিস্কুট দাও। তোমরা খেয়ে নাও। হ্যাঁ জগা, বলো আবার কী হ'ল। অনেকবারই তো বদল...

জ - আজ্ঞে হ্যাঁ বদল। কিন্তু আসলেই কি জানেন – জমিখান যখন একটা সত্যিকারের সৎকাজে লাগাবই... কি বলেন উকিলবাবু?

তী - আমি কি বলব বলো? তুমিই তো গত হপ্তায় পাকা কাজ, পাকা কথা আরও কত কথা বলে বিদায় নিলে।

জ - এক্কেবারে ঠিক কথা। কিন্তু একটাই তো জমি, একটু ভালমতো ভেবেচিন্তে কাজ করাই তো উচিত!

তী - বলো, বলে যাও। গত তিন মাস ধরে এই চলছে। আমি ভাবলাম গত সপ্তাহেই বুঝি শেষ হ'ল।

জ - আপনি বিরক্ত হচ্চেন উকিলবাবু। এই জগার সাতকুলে কেউ নেই, কেউ 'একটু বস রে জগা' বলেও কতা কয় না। শুধু আপনার দুটি ছিচরণে আব্দার করি – দোষ নেবেন না।

তী - অনেক আব্দার, ভাবনা করেই তো গত সপ্তাহে কাগজপত্র সব তৈরী হয়। জমিটা লাইব্রেরির জন্য, সে কথাই তো বললে।

জ - হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইরকমই কথা হ'ল।

তী - কথা হ'ল? সব লেখাপড়া পাকা করে তোমার টিপছাপ নিয়ে তবে...

জ - ঠিকই তো, ঠিকই তো, আপনি লিখলেন – "আমি ছিরিযুক্ত বাবু জগন্নাথ চকোত্তি অদ্য স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীলে লিখিতেছি যে আমার নি-জস্ব যে জমিখান আচে..."

তী - সবই তো গড়গড়িয়ে বলে গেলে – তাহলে?

জ - তাহলে! তাহলে বললে হবে উকিলবাবু? রাত'ভর শুধু ভেবেচি – জমিখান লাইবেরিরে দিলে পরে ভবিষ্যতে পাড়ার পাঁচটা মাস্তান ছোকরা যদি ওইখানে আড্ডাখানা বসায়, বিড়ি ছিগারেট খায়, বইপত্তর ছেঁড়ে, তখন?

তী - আরে জগা, কতবার তোমায় বলেছি যে উইল কার্যকরী হবে তোমার মৃত্যুর পর হে। তুমি তো আর দেখতে আসছ না।

জ - আঁ! কী কইলেন?

তী - ঠিকই তো বললাম।

জ - দেখতে আসব না বলে আমার কোনো দায়-দায়িত্বি নেই? বিবেক-বুদ্ধি নেই? বত্তমানের ছেলে ছোকরাদের মতিগতি দেখেচেন? এই তো সেদিন আপনার এখান থেকে বেরিয়ে আমি ফিরচি, একটা ছোঁড়া আমায় পেরায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আবার বলে গেল – সর শালা! ভাইবতে পারেন! সেদিন থেকে আমি শুধু ভাবচি আর ভাবচি...

তী - জগন্নাথ, তবে তার আগে যেটা লিখেছিলাম, হাসপাতাল, ওটাই বরং করো। ওই কাগজগুলো অনেকটাই এগিয়েছিল, আমার কাছে রাখা আছে।

জ - না না, আপনার মাতা খারাপ! হাসপাতাল কখনোই না। ওখানে গরিব লোকেদের ঢুকতে দেয় না, শুধু বড়লোকদের মোচ্ছব। তাচাড়া কত অনাচার, কেলেঙ্কারি, পাপচক্কর। রোগী ওষুধ পায় না – পথ্যি পায় না – ছ্যা ছ্যা – ছাড়েন, ছাড়েন।

তী - দেখো জগন্নাথ, তোমার নিজেরই মনস্থির নেই। নয়-নয় করে চার-পাঁচটা ড্রাফট হ'ল, আর বাতিল হ'ল। শুরু করেছিলে শিবমন্দির দিয়ে। ভালই হতো, তোমার পুণ্য অর্জন হতো।

জ - এ পোড়া দেশে পথেঘাটে শিব দেবতার কত থান আচে, সে কথা জানেন? সব ভেঙেচুরে পড়ে আচে। না পূজাপাঠ, না কিস্যু। আপনারা আর দেইখবেন কোত্থেকে, টেরেনে যান, বা গাড়িতে যান। এই জগার মতো পথে পথে হেঁটে বেড়ালে দেখতি পেতেন।

তী - আচ্ছা, এবার তোমার শেষ ইচ্ছেটা বলো দেখি। আজ একটু তাড়া আছে। তোমার ফাইনাল প্ল্যানটা বলো।

জ - জানি উকিলবাবু, আপনাকে কত বিরক্ত করি। আপনার বাড়ির লোকেরাও সব দেবতা। এখানে এলেই আমাকে কত যত্নআত্তি করে চা মুড়ি দেয়। না না এটাই আমার ফাইনাল – একেবারে ফাইনাল!

তী - শোনো জগন্নাথ, একবার তুমি যে বলেছিলে কোনো এক স্কুলবাড়ির জন্য জমিটা দেবে, সেটাই আমার মতে সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব। শিক্ষার চেয়ে বড় জিনিস নেই, জানো তো কথায় বলে "আলোকহীন মনুষ্যজীবন, বিগ্রহহীন মন্দিরের তুল্য।"

জ - হেঁ হেঁ, আমি কি অত দামি দামি কতা জানি উকিলবাবু? তবে হ্যাঁ, আপনি যা বলেন, আমি তা সব বিশ্বেস করি| আপনি পন্ডিত লোক, কত নেকাপড়া জানা! আর এই যে হতভাগা জগা – কেলাস ফোর পড়া, কোনো জ্ঞানবুদ্ধিই নেই|

তী - বেশ, তাহলে স্কুলই ঠিক তো? দেখি পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে, ওটার ড্রাফ্টও বোধহয়...

জ - মাতা খারাপ আপনার উকিলবাবু? জানেন না, আজকাল শিক্ষেয় কত দুননেতি? খপরের কাগজে তো সব লেখা থাকে – পড়েননি? আমার এত কষ্টের জমিটা ওই দুননেতির পায়ে অপাত্রে কন্নাদানের মতোন দান করে বসব?

তী - আর কতদিন এভাবে চলবে জগন্নাথ? সত্যিই আমার মাথা ঝিমঝিম করছে| যা বলার বলে ফেলো|

জ - বলব; এই বলছি| দাঁড়ান এই চাটুকু খেয়ে নিই| মা জননী কত যত্নআত্তি করে মুড়ি দে গেলেন, একটু তেল আর বাদামও দেচেন| এক্কেবারে সাক্ষাৎ মা নক্ষি – আঃ (চা খেতে খেতে)!

তী - শিবমন্দির, হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরি – সব বাতিল, আর কীই বা হতে পারে? আমার তো কিছু মাথাতেই আসছে না|

জ - (চায়ের কাপে সুখটান দিয়ে) এবারেরটাই বাবু ফাইনাল| একখান আশ্রম করতে চাই| এটাই পাকা কথা|

তী - আশ্রম? তার মানে? কাদের জন্যে?

জ - জানেন উকিলবাবু, অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম মনিষ্যিদের জন্যে কিছু করার আর দরকার নেই| সেটা নেহাৎ ওই যে কতায় বলে না তেলা মাথায় তেল দেওয়া| তাই না?

তী - কী যা তা বলছ? মনিষ্যি মানে মানুষদের জন্যে করবে না? তবে কি রাস্তার কুকুর বেড়ালের জন্য...

জ - এক্কেবারে খাঁটি কথা| তাই তো আপনারে দেবতা বলি| জমিটা আমি পথ কুকুরদের জন্য উচ্ছুগ্গ করব|

তী - কাদের জন্যে? কী বললে?

জ - পথে পথে ঘুরে বেড়ানো নেড়ি কুত্তাদের জন্য – আপনি ঠিকই ধরেচিলেন| ওদের জন্য ভাববার কেউ নেই| ঝড়ে জলে দুদ্দুশার অন্ত নেই; ঠিক এই জগার মতো – দেখেচেন কখনো কাঠফাটা রোদে হাঁপিয়ে মরে, আর যেখানে যায় সব দূর দূর করে তাড়ায় – ওদের দুঃখে পেরাণটা ফেটে যায় আমার| আর একটু...

তী - জগন্নাথ, আমি সত্যিই আর পারছি না| আমারই শরীর খারাপ লাগছে – প্রাণ ফাটছে|

জ - ওমা, সেকি কতা! একটু জল খাবেন বাবু? ভেতর থেকে চাইব?

তী - না না, তুমি তাড়াতাড়ি বলে ফেল – এটা শেষ করি|

জ - হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চই! ওই যে বলছিলুম – ওদের জন্যই একটা আশ্রম গড়ে যদি একটু আচ্ছয় দেওয়া যায় – কী বলেন উকিলবাবু?

তী - ওই নেড়ি কুত্তাদের জন্য? রাস্তার অতগুলো...

জ - কেন বাবু? ওরা ভগমানের সৃষ্ট জীব নয়? এই মনিষ্যিদের তো বাড়ি-গাড়ি-বিছানা-সোফা – কত কি আছে! ওদের কী আচে বলুন? খেতেও পায় না দুমুঠো, ঠিক এই অভাগা জগার মতো| তাই স্থির করে ফেলেচি, এক্কেবারে ফাইনাল|

তী - (জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) ঠিক আছে| এই তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত!

জ - কতা আপনি একবারে বুঝে যান| তাহলে আর দেরি কেনে? এইবারে নিকে ফেলেন – আমি ছিযুক্ত জগন্নাথ চক্কোত্তি অদ্য – এয়ি যাহ... আজ কত তারিখ যেন?

(শুভঙ্কর ঘরে ঢোকে)

শু - বাঃ বাঃ! খেলা দেখছি বেশ জমে ক্ষীর| জগন্নাথবাবু, তাহলে এতদিনে আপনার দানধর্ম করতে সত্যিকারের পাত্র পেলেন| বাঃ বাঃ!

তী - শুভ, তুই কী করছিস এখানে – ভেতরে যা, যা|

শু - তুই থাম দাদা| ব্যাপারটা জগন্নাথবাবুর সঙ্গেই বুঝে নিই| তা ওরা তো গুনতিতে কম নয়, অনেক! ওদের জন্যে আশ্রম বানানো তো বি-রা-ট ব্যাপার| তা অবশ্য, আপনার তো জমিদারি আছে|

জ - না না ছোটকত্তা, আমি বোকাসোকা সরল মানুষ, আমার মানুষের মতোই একখান জমি|

তী - শুভ, তুই থামবি? আমাকে কাজটা শেষ করতে দে|

শু - আশ্রম বলে কথা, বলুন বলুন শুনি ব্যাপারটা|

জ - আশ্রম মানে একটা ছোট আচ্ছয়ের কথাই বলচিলাম|

শু - ওই একই হ'ল| আশ্রয় আর আশ্রয়| তা জমিটা আপনার ক'বিঘে, ক'কাঠা?

জ - (ঢোক গিলে) আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি অত মাপজোক জানি? সময় হলে লোকজন সব মেপে নেবে| তাই না

উকিলবাবু?

শু - ঈশ! কত লোক লাগবে জমি মাপতে! দারুণ ব্যাপার জগন্নাথবাবু| তা নিজের জমির মাপ জানা নেই? জমি 'কোথায়' তা জানা আছে তো?

তী - শুভ, চুপ করবি?

শু - কই হে জগন্নাথবাবু, জমি কি এই ভোলাপুরে নাকি তাও জানো না| এত বড় সম্পত্তি বলে কথা|

জ - ভোলাপুরে কেন হতি যাবে – জগন্নাথ কি এই ভোলাপুরের নোক? কবে কখন ঘুরতে ঘুরতে এই উকিলবাবুর সঙ্গে ট্রেন ইস্টিশনে পরিচয় হয়ে, একদিন উকিলবাবুর মাল বয়ে দিয়ে তবেই তো –

তী - হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে আমার| শুভ, কাজটা সারতে দে, বেশিক্ষণ লাগবে না, ভেতরে যা তুই|

শু - না দাদা, আমাকে বুঝতে দে| বাড়িটা আমারও| এখানে মাসের পর মাস একটা উটকো লোক কেন আসছে, সকাল থেকে বসে থাকছে, চা মুড়ি খাচ্ছে, সময় নষ্ট করছে – তা আমারও বোঝা দরকার|

তী - শুভ প্লিজ; গরিব মানুষ –

শু - থাম তো তুই| তা জগন্নাথবাবু, আপনি এখন নেড়ে কুত্তাদের দুঃখে মরে যাচ্ছেন – থুড়ি মরে যাচ্ছেন না, ব্যথা পাচ্ছেন – আপনার হরি তো আবার আপনার খবরও নেয় না| তা আপনি মারা যাবার পর আপনার সেই বিখ্যাত জমি এই সাংঘাতিক দরকারি কাজে ব্যবহৃত হবে| তাই তো? আহা মরে যাই, মরে যাই!

জ - ছোটবাবু, আপনি ঠিকই কইছেন – উকিলবাবু বলেছেন উইল কায্যকরী হয় মিত্যুর পর|

শু - এই সেরেছে, দাদা এ যে সবই বুঝে গেছে দেখছি| তা জগন্নাথ বাবাধন, তুমি বেঁচে থাকতেই জমির হদিশ মিলছে না, তাহলে পরে কী হবে? তোমার ওই 'কায্যকরী' হবে কী করে?

তী - শুভ, মালিনী তোকে বাজারে যেতে বলল – যা যা, যে কোনো সময়ে বৃষ্টি এসে যাবে|

শু - চুপ কর দাদা... জগন্নাথ চক্কোত্তি মশায়, একটু ভাল করে ভেবে দেখো তো, তোমার জমিটা কোথায়? কলকাতার গড়ের মাঠটাই তোমার নয়তো? নাকি হাওড়া ময়দান!

জ - কী বলছেন ছোটবাবু – গড়ের মাঠ! আপনি, আপনি কি আমার সঙ্গে মস্করা কইরতেচেন|

তী - শুভ, কী হচ্ছে কী? যা, এক্ষুনি ভেতরে যা|

শু - আরও আছে – ইডেন গার্ডেন, ধাপার মাঠ – আঃ কত সম্পত্তির মালিক আমাদের জগন্নাথবাবু|

জ - (চিৎকার করে) ছোটবাবু, থামুন থামুন| আমি কি আপনার মস্করার যুগ্যি? আমি ছোট মানুষ, গরিব মানুষ, দুবেলা খেতেও পাই না – একটু শুদু সৎ কাজ কইরব বলে...

শু - করো না, কত সৎ কাজ করবে করো! কে বাধা দিচ্ছে? এই পৃথিবীটাই তো তোমার হে বাবু – এত আকাশ বাতাস, তা তোমার জমিটা মাটিতে (হা হা) না আকাশে?

জ - (চোখ দিয়ে আগুন, এক ঝলক জল) এই – এই কতাটা আপনি বলতে পারলেন ছোটবাবু? জগার জমিখান আকাশে! এত অবিশ্বাস! এত বড় বিশ্ববোমভান্ডে অভাগা জগার এক ছটাক জমিও নেই!

তী - শুভ, কেন এসব কথা বলছিস? সরল একটা মানুষ –

শু - ন্যাকামো রাখ দাদা – উইল হচ্ছে, টিপসই পড়ছে আবার উইল বদল হচ্ছে – দিন-সপ্তাহ-মাস কেটে যাচ্ছে| আর জমি নাকি বিশ্বব্রম্ভান্ডে – "মহান এই জমিদার জগন্নাথ চকোত্তি মশায়" –

জ - ছোটবাবু, আমি পাগলছাগল মানুষ| উকিলবাবুর অনেক কিরিপা| হিসেবপত্তর রাখতে পারি না, তাই তো ঘুরে ফিরে আসি| দলিল পত্তরের হিসেব নেই| তা বলে জমিটাই নেই! পৃথিবী থেকে অ্যাইক্কেবারে আকাশে তুলে দিলেন? উকিলবাবু, ও উকিলবাবু, আপনি মুখ নামিয়ে বসে কেন? মুখ তো আমারই নামানোর কথা! আমারই! (ময়লা ধুতির কোণ দিয়ে চোখ মুছে) জগা ব্যাটা হতভাগা – জন্ম দিতে গিয়ে মা মরেছে – বাপেরে চোখেও দেখিনি| বুড়ি দিদিমার কোলেপিঠে কোনোমতে মানুষ হইছি, নাম দিয়াছিল জগতের নাথ – তবু, জগা একটাও মিছে কতা কয় না| ছোটবাবু, এই জগন্নাথ চক্কোত্তি হতভাগা ঠিকই – কিন্তু বলেন তো – ঈশ্বর কি এক্কেবারে নিঃসম্বোল করে শূন্যে ছুঁড়ে দেছে! মনিষ্যি পিছু এক ছটাক জমিও দেন নাই! এমন কি হয় কখনো?

শু - অত বকবক করো না| জমির ঠিকানাটা বলো, দেখি তোমার দৌড় কতদূর|

জ - বলি, ভগমান সকলের তরে একখণ্ড ভূমি বরাদ্দ রাখে

নাই – এ কতাই কি আপনি বলতে চান?

শু - বারবার এক কথা কতবার বলব? আর তাছাড়া ভগবান এখানে কোত্থেকে এল?

জ - এলেন নাই? আমরা তো তাঁরই সিষ্ট জীব – না কি তাও মানবেন না। বলি, মনিষ্যির মাটির বরাদ্দ নাই তাঁর? আপাতত খুঁজে পাচ্ছি না, সেইটেই বড় দুঃখু। জেবনভোর খুঁজতেচি – তাই বলে কতাটা উড়িয়ে দিতি হবে? আপনারা হলেন গিয়ে শিক্ষিৎ মানুষ – বাড়ি আছে, গাড়ি আছে – উকিলবাবু কোনোদিন আমার সঙ্গে গলা তুলে বকে কতাটি কননি – আর আপনাদের আইজ এই বিচার।

তী - (হঠাৎ চিৎকার করে) আমাদের কোনো বিচার নেই জগন্নাথ, আমরা শিক্ষিত তাই এত অসভ্য।

শু - তুই আমাকে বলছিস, তাই না দাদা? হ্যাঁ, আমি অসভ্য – সহ্যের সীমা শেষ হয়ে গেছে আমার। একটা হেস্তনেস্ত আজই হবে। এখন তুই ভেতরে যা, আমি জলবিচুটি দিয়ে এই ভূত আজই ছাড়াব। বলো, জগন্নাথ তোমার ঠিকানা বলো আর পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

জ - ভয় দেকাবেন না ছোটবাবু। জগা ছোটলোক হলেও কাউকে ভয় করে না... এই জগা শুধু সত্যি কথাই বলে, আর সকলের জন্য ভাল কথাই বলে। বলি, আমার নামে ভগমানের যে জমিটুকু আছে তা আমি বেচে খেতে চাই না, উড়িয়ে দিতেও চাই না, শুধু একটা ভাল কাজে লাগাতে চাই। যাতে অন্যের ভাল হয় – শুধু এইটুকুই। থাক উকিলবাবু – উইলে আর কাজ নাই – খুব খুব শিক্ষে হয়ে গেল আমার – ধুত্তোর পৃথিবী!

(জগা সটান উঠে মুড়ির বাটি ও কাপটা জোরে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়)

তী - কেন, কেন এমন করলি? কার কী ক্ষতি করেছিল ও! উফ, এত অপমান করলি! ছি, ছি –

শু - দাদা, চুপ কর! পাগলের সাথে তুইও কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? আমি আজ ভূতের ভূত না তাড়ালে বাকি জীবনের সব রবিবারেই এই উইল পর্ব চলত।

মা - বাপরে, কী হ'ল? ভেতর থেকে শুনছিলাম। যেন যুদ্ধ হচ্ছিল এখানে। আরে আরে, গেল কোথায় সে?

তী - ভোলাপুরের পথেঘাটে আর কোনোদিন ওকে দেখা যাবে না। সরল সাদাসিধে মানুষ – সৎ একটা উদ্দেশ্য, সামান্য একটা ইচ্ছে – শুভ, ভেবে দেখ তো তুই আমি – আমরা সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মে জীবনে কিছু সুবিধা পেয়ে গেছি কপালজোরে। তাই অভাগা জগাদের জমিটাকে আকাশে পাঠিয়ে দিই অনায়াসে। বাহ! একেবারে আকাশে!

****

নিবেদন:

এই নাটকটি কয়েক বছর আগে MIST-এর পক্ষ থেকে হিউস্টনে অভিনীত হয়েছিল। MIST-এর সদস্যদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং ধন্যবাদ জানাই। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পটিতে নাট্যরূপ দেবার আগে আমি তাঁর পরিবারের কাছে যথাযথ অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলাম। তবে পাঠকদের জন্য বলে রাখি আশাপূর্ণা দেবীর এই গল্পের থেকে বর্তমান নাট্যরূপটি একটু পরিবর্তিত করেছি এবং অভিনয়ের কারণে মালিনী চরিত্রটি নতুন সংযোজন। জগন্নাথের কথার ধরন আঞ্চলিক চলতি ভাষায়। এই নাটকটি পরিবেশনের সময় সেই ভাবধারাটি বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গল্পটির মধ্যে বেদনা অথচ চিরন্তন একটি সত্য লুকিয়ে আছে। নাট্যরূপ দিতে গিয়ে আমার বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির কথা মনে পড়েছে –

"আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে –
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!"

~সুমিতা বসু

পিকচার প্যালেস

এস এস নেওয়াজ

“I am Spartacus.”

কার্ক ডগলাস মুখ খোলবার আগেই একে একে হাজার কণ্ঠ একই নাম উচ্চারণ করল, ‘I am Spartacus’| হতভম্ব রোমান সেনারা সেই উত্তাল জনতার ঐক্যবদ্ধতার মুহূর্তটি অনুমান করতে পারল | রূপালি পর্দার ছবি দেখে আমরা সব কলেজ পড়ুয়ারা মন্ত্রমুগ্ধ, হতভম্ব!

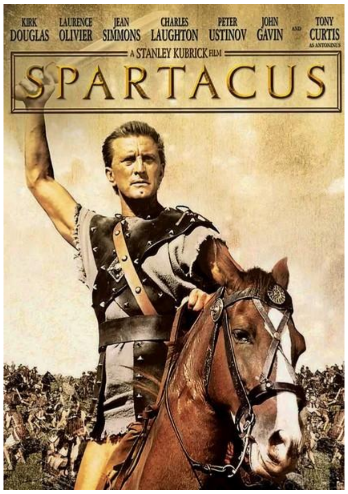

শহরে সিনেমা হল তিনটি| উল্লাসিনী– যেখানে শুধুই বাংলা ছবি দেখানো হয়; উত্তম-সুচিত্রার ছবি, ‘অগ্নি পরীক্ষা’, ‘সবার উপরে’ বা ‘হারানো সুর’|

বাণী হলের নতুন নাম সোসাইটি | এটাতে প্রায়ই পুরনো হিন্দি বা লাহোরের ছবি আনে; ‘বহুত দিন হুয়ে’, ‘ইনসানিয়াত’, ‘আন’ – এসব| প্রত্যেকদিন রিকশায় মাইকে ঘোষণা করা হয় দুর্ধর্ষ রঙিন ছবির শো টাইম ৩টা, ৬টা ও ৯টায়| আর ‘বহুত দিন হুয়ে’, বা ‘ইনসানিয়াত’ হলে তো কথাই নেই| রিকশার বহরের সাথে হাতি বা ইনসানিয়াতের সেই বাঁদরের পুতুল এই কাফেলার (যাত্রীদল) সাথে সারি বাঁধে | সন্ধ্যায় এসব ছবির বা অন্য পুরনো কোনো হিন্দি গান সিনেমা হলটি থেকে মাইকে প্রচারিত হয়| ছবিগুলো প্রায় সবসময় হাউস ফুল রাখে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে | তিন ঘন্টার ছবি বার বার দেখতে দর্শকদের উৎসাহে কোনও ঘাটতি নেই | ছোট ছবি দেখলে পয়সা উসুল হয় না | আর ‘আন’ ছবির একমাত্র রঙিন দৃশ্যে যখন দিলীপ কুমার টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গান ধরে –

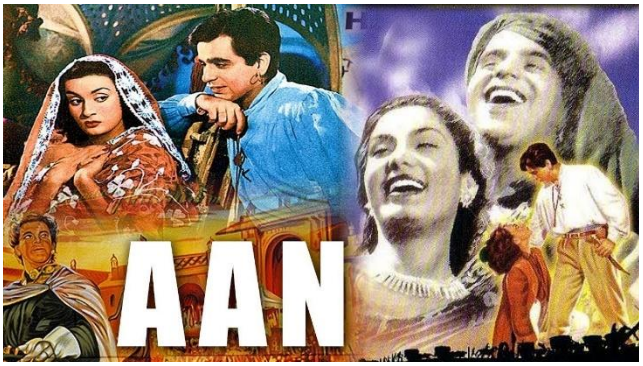

দিল মে ছুপাকে পেয়ার কে তুফান লে চলে... তখন সব ওঁৎ পেতে থাকা দর্শকরা সিটের ওপর পা উঠিয়ে বসে একসাথে সিটি বাজিয়ে সিনেমা হলটা মুখর করে তোলে | আর পাঁড় দর্শকরা সিনেমা হলের বাইরে বিক্রি হওয়া দু’আনা দিয়ে চটি বই কেনে, তাতে হিন্দি ছবির গানের কথাগুলো বাংলায় লেখা থাকে | আর সেটা হেফজো (মুখস্থ) করে হাঁটতে হাঁটতে গাইতে পারাটা এক দারুণ গর্বের ব্যাপার |

অন্য সিনেমা হলটির সাম্প্রতিক নাম ‘পিকচার প্যালেস’| দেশ বিভাগের আগে এটার নাম ছিল নীলা হল | পাকিস্তানে চলে আসা কোনো এক অবাঙালি ব্যবসায়ী হলটি কিনে নাম ও আঙ্গিক পুরোপুরি বদলে দিয়েছে | এয়ার কন্ডিশন হ’ল, নতুন সিনেমা স্কোপ পর্দা হ’ল, বাইরের জাঁকজমক বদলে গেল – সে এক এলাহী ব্যাপার| প্রত্যেকদিনের শোগুলো হাউজ ফুল; রমরমা ব্যবসা | তার সাথে আবার যোগ হ’ল শুক্র আর রবিবারের মর্নিং শো – সকাল সাড়ে দশটায় শুরু | এগুলো সব ইংরেজি ছবি – Spartacus, The Birds, Psycho, Ballad of a soldier, Two women, Guns of Navarone ইত্যাদি |

রবিবার কলেজ খোলা, তাই প্রত্যেক শুক্রবার এসব ইংরেজি ছবিগুলো দেখা ছিল আমাদের কয়েকজন বন্ধুর নিয়মিত রুটিন | যদিও ছবিগুলোর প্রায় অর্ধেক সংলাপ বুঝতে

পারতাম না; কিন্তু এগুলোর যে অন্য স্বাদ, তাতেই মন ভরে যেত। এসব মর্নিং শোগুলো কোনো সময়ই হাউজ ফুল হতো না। এক বা দুটো শো-এর পরে আর চলত না। কিন্তু পিকচার প্যালেস-এর এই মালিক লোকটি নিয়ম করে ইংরেজি ছবিগুলো দেখাতেন।

এই ব্যবসায়ী লোকটি অন্যসব অনেক অবাঙালি মুসলমানদের মতো দেশ বিভাগের পরে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে এখানে। তারা আসত কেউ পাটনা, কেউ কানপুর – অথবা বিহার বা ইউপি-র নাম-না-জানা কোনো জনপদ থেকে। এরা অনেকে রেললাইনের গার্ড, চেকার বা ড্রাইভারের কাজ করত। এই সম্প্রদায়ের একটা ঢালা নাম ছিল – 'বিহারী'। নামটার সাথে একটা তাচ্ছিল্য ও উন্নাসিকতার বা সরাসরি সংঘর্ষমূলক মানসিকতা ছিল আমাদের। এরা কোনোদিন বাংলা শেখেনি, বাংলা সমাজের সাথে একত্রিত হতে চেষ্টাও করেনি। তাই বাঙালি সমাজের কাছে তারা স্বীকৃতি পায়নি, অনেকটা ফিফথ কলামিস্টদের মতো।

এই বিহারী সিনেমাওয়ালা কিন্তু আমাদের দিয়েছে অনেক। এসব ইংরেজি ছবি দেখানো ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক ছিল না, সেটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ ছবিগুলো ছিল আমাদের জন্য বাইরের পৃথিবীর একটা খোলা জানলা। সেই না-জানা পৃথিবীর সব দমকা হাওয়া আমাদের উজ্জীবিত করত।

এইসব ছবিগুলো দেখবার অনুপ্রেরণা ছিল আরেকজন – সবিতাকাকি। সম্পর্কে আমার দূর সম্পর্কের বদরচাচার স্ত্রী। কলেজ লাইফে কলকাতায় পড়বার সময় বদরচাচার সাথে তার পরিচয়। দেশ বিভাগের পরে মুসলমান স্বামীর হাত ধরে সবিতাকাকি চলে এসেছে পূর্ব বাংলায়। সরকারী চাকুরে বদরচাচা একজন মুন্সেফ। ছোট শহরে সবাই সবাইকে চেনে। মুসলমান বাড়ি থেকে কপালে সিঁদুর দিয়ে এক হিন্দু মহিলা সংসার করছে – তা যে সমাজে স্বীকৃত নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। বদরচাচার মুন্সেফগিরি চলে আইনের গতিতে – তার পাঙ্খাওয়ালাদের বাতাস করবার মতো মৃদু মন্দে। সন্তানহীন এ দম্পতির জীবনে কিন্তু নানা রঙের কোনো ঘাটতি নেই। সবিতাকাকির সাথে যাতায়ত আমার নিয়মিত। কোনোদিন হুট্ করে সন্ধ্যায় এসে পড়লে এই দম্পতির যুগলবন্দী সেতার শোনা যেত। এতে পাড়াপড়শীর দারুণ আপত্তি – সন্ধ্যায় মাগরেবের নামাজের সময় পার হলে তারা যেন এসব না-জায়েজি গান বাজনা করে না। মুন্সেফ মানুষ বলে কথা, তাই একটু সমীহ করে বলা।

সবিতাকাকি প্রায়ই কলকাতা যান। ফেরার সময় সাথে আসে শারদীয় পত্রিকা, আনন্দবাজার বা বেতার জগৎ। আর তার কাছ থেকে পেতাম নতুন হলিউড ছবির গরম গরম খবর। রোমান হলিডে (গ্রেগরি পেক আর অড্রে হেপবার্ন) আসছে জেনে সবিতাকাকি প্রচন্ড উৎসাহে বললেন, "দারুণ ছবি, আমি কলকাতায় তিনবার দেখেছি, অবশ্যই দেখবি।" এরপর থাকত তার প্রস্তাবিত ছবির তালিকা – Hunchback of Notre Dame, Snows of Kilimanjaro, PT109, Psycho - এরকম আরো অনেক। আর ছবিগুলো পিকচার প্যালেসে

আসলেই তক্ষুণি দেখে ফেলতাম আমরা। পিকচার প্যালেস তো ছিল আমাদের সিনেমা প্যারাডিসো!

শহরে আরেকটি বেমানান দম্পতি ছিল; সম্পর্কে আমার এক মামা আর তার জার্মান স্ত্রী, লুইসা আন্টি। ভদ্রমহিলা বাংলা লিখতে পড়তে শিখলেন, কথা বলা শিখলেন, ছেলেমেয়েরা বাংলায় কথা বলে। আন্টি গাড়িতে বা রিক্সায় বেরোলে পথচারীরা বার বার ঘুরে তাকায়। এসব নাকি তার সয়ে গেছে। কেউ তাকে সাদরে গ্রহণ করেনি; কিন্তু সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রহণ করেছে এদেশের সবকিছু। এদেশ তার স্বামীর দেশ, এ ভাষা তার ভালবাসার লোকের ভাষা, এ শহর তারই শহর।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীটা যে সত্যিই খুব ছোট তার একটি উদাহরণ – বহু বছর পরের কথা, কর্মজীবনে জার্মানিতে যাওয়া আসা আমার। আমি বাংলাদেশের মানুষ শুনে এক জার্মান ভদ্রলোক, জোয়াকিম মিটিং-এর পরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বাংলাদেশের খুলনা শহরটি কোথায় জানো?" একটু চমকে উঠে বললাম, "ওটা আমার জন্মস্থান; তা, হঠাৎ খুলনার কথা কেন?"

- "না, ওখানে এক জার্মান মহিলা থাকেন।
এবার আমি তাঁকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "তার নাম কি লুইসা?"
কোনো এক সময়ে তাঁরা জার্মানির 'বন' শহরে পাশাপাশি অ্যাপার্টমেন্টে প্রতিবেশী ছিলেন।

দৈবাৎ ঘটনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে অদ্ভুতভাবে। দেশ বিভাগের পরে ১৯৫০ সালে আমার পিতামহ কাজী আব্দুল খালেক খুলনা শহরে পুকুরসহ এক বিঘা জমির একটি বাড়ি কেনেন। পুকুরের চারপাশে আম, জাম, নারকেল, সুপারির শ্যামল ছায়া – এক অনির্বচনীয় শান্তির পরিবেশ। তাঁর প্রতিবেশী দেশত্যাগী পরিবারটির নাম ছিল – ভদ্র। ভদ্র-বাড়ির কামরাগুলো ছিল ইঁট দিয়ে বানানো, আর উপরে গোলপাতার ছাওনি। ইঁটের দেওয়ালে ছিল কিছু কাঁঠাল তক্তার তাক। আর সেই তাকগুলোর উপরে ছিল একের পরে এক বই – সব দেব সাহিত্য কুটিরের কিশোর সাহিত্যের সংকলন। ভদ্র পরিবারের সাহিত্য অনুরাগের নিদর্শন – দেশ ত্যাগের সময় এগুলো আর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এগুলো ছিল আমার জন্য গুপ্তধনের সামিল। সমুদ্রের রহস্য, জাপানি রূপকথা, ক্রাকাতুয়া আর অজস্র লেখার ঠাসবুনানি পড়বার জন্য স্কুলের পরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম আমি। আমার মনের 'দক্ষিণ দুয়ার খোলা' এক অপূর্ব সম্ভার!

এই সবিতাকাকি, ভদ্র পরিবার বা পিকচার প্যালেসের বিহারী মালিকটি যে সমাজে তাঁদের জীবনের এক বিরাট অংশ পার করেছেন, সে সমাজ তাঁদের আপন করে নেয়নি কোনোদিন। কিন্তু এই অন্য জগতের মানুষগুলোর সংস্পর্শে এসে আমাদের জীবন হয়েছে আরেকটু উজ্জ্বল। যে সমাজে আমরা বাস করেছি, সেখানে পাশের বাড়ির অন্য জেলার মানুষকে পর্যন্ত আমরা আপন করে নিতে পারিনি; সেখানে এইসব ভিনদেশী, ভিন্ন সমাজের মানুষদের তো কথাই নেই। এরা আমাদের সূর্যরশ্মিতে রাঙিয়ে দিয়েছে। সাহায্য করেছে আমাদের মানসিক গঠন তৈরি করতে। এমন মানুষদের পেয়ে আমরা ছিলাম ভাগ্যবান, কিন্তু তাদের ভাগ্যে আমাদের বন্ধুত্বের হাত পৌঁছাতে পারেনি।
আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আরও অনেক অনেক দূর!

নীরা

সোমা ঘোষ

নীরা অনেকক্ষণ ধরে গালে হাত দিয়ে রাস্তার ধারে বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলের পড়ে আসা নরম আলোয় সামনের সরু একফালি পার্কটার গাছগুলো আকাশের গায়ে নকশার মতো দেখাচ্ছে, তাই দেখছিল এক মনে। সদ্য বিগত শীতের হিমেল ছোঁয়া বেলাশেষে কেমন যেন ঠান্ডা ছ্যাঁকা দিচ্ছে গায়ে, পাতলা খদ্দরের চাদরটা আরেকটু গায়ে টেনে নিল নীরা। পার্কটার একদিকে লাল দোলনাগুলোয় এ পাড়ার যত ক্ষুদে মাথাদের ভিড়, দলাদলি, গলাগলি চলেছে পুরোদমে। তাদের সাথে আসা কয়েকজন বৃদ্ধ বসে আছেন একটু দূরে পাঁচিলের গা ঘেঁষা লোহার বেঞ্চিগুলোয়। নীরা খানিক বোঝার চেষ্টা করল কী কথা চলেছে তাদের মধ্যে। হয়তো বার্ধক্যের অভিশাপ লাগা জীবনের দায়বদ্ধতার হিসাব নিকাশ করছেন, কে জানে? হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যাবার কিছুদিন আগে অবধি ওর ঠাকুরদা যেমন ওর হাত ধরে পার্কে নিয়ে গিয়ে ওকে ওর বন্ধুদের কাছে ছেড়ে দিয়ে 'এই বয়সে কি আর ক'মাস বড়ছেলের বাড়ি আর ক'মাস ছোটছেলের বাড়ি – এই চক্কর কাটা চলে...' এই আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়তেন। গেটের পাশে শৌখিন পাতলা উলের চাদর গায়ে দুই বিগত যৌবনা ঠাকুমা রেলিং-এ হেলান দিয়ে সংসারের প্যাঁচ কষে চলেছেন। বাকী যারা, তাদের মধ্যে চলেছে 'সাহেব আর ম্যাডামের' পিন্ডি চটকানো। সারাদিন 'ডবল ইনকাম' ফ্যামিলির ঝি হয়ে সংসারের গিন্নীপনা করা আর বিকেলে এসে সেই বাড়ির সব রসালো গল্প হাটে চাউর করা।

ওদের এই পাড়াটা বড় রাস্তার বাজার পেরিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরলেই প্রথম গলি – কিন্তু বড় রাস্তার হৈ হট্টগোল কিছুই টের পাওয়া যায় না। অটো-স্ট্যান্ড আর ফুলের দোকানটা পেরিয়ে বাঁদিকে গলির ফটকে ঢুকে পড়লেই মনে হয় অন্য জগৎ। তারও পর নীরারা যে বাড়িটায় ভাড়া থাকে, সেটা ওদের গলির প্রায় শেষ মাথায় – আর বেশ সুন্দর দেখতে – দুধারে দুই সারি বাড়ি আর মাঝে এক ফালি পার্ক।
বিয়ের কয়েক মাস বাদেই গোটা আষ্টেক কার্টন, পাঁচটা স্যুটকেস আর দুটো গোদা স্ট্রোলি নিয়ে এসে নেমেছিল

কলকাতা রাজধানী থেকে, দিল্লীর কাশ্মীরী গেটে। সাথে মাত্র কয়েক মাস পুরনো স্বামী রাতুল। সংসারটিও বেশ পাকা গিন্নীর মতোই গুছিয়ে ফেলেছিল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। আর গত ছ'মাসে বেশ কয়েকজন বন্ধু পাতানোও হয়ে গেছে – কাবেরী, সুদীপা, তমগ্না, সিমরন। ভালই আছে নীরা। 'এখন অপেক্ষা কবে এ পাড়ার স্কুল থেকে আমার ইন্টারভিউ কলটা আসে' মাকে কাল রাতে নীরা ফোনে বলেছিল, 'দিল্লীতে এসে তো ছ'মাস হাত গুটিয়ে বসেই আছি।'

স্কুলের চাকরিটা ইচ্ছে করেই নেবে ঠিক করেছে নীরা। কলকাতায় বেশ কয়েক বছর বিজ্ঞাপনের রকমারি মারপ্যাঁচ নিয়ে লড়ে এসেছে একটা অ্যাড এজেন্সিতে। ফর্সা হওয়ার ক্রীম বেচতে আর ভাল লাগে না ভেবে হালকা একটা হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে। ক্রীম, সাবান, তেল আর পটাটো চিপস বেচার জন্য কত রকম মিথ্যাই না সাজিয়ে গুছিয়ে রঙ চড়িয়ে বলতে হয়েছে। কলকাতায় তো আবার আরও মজা – বম্বে থেকে তারকা খচিত বিজ্ঞাপন তৈরি হয়ে আসত হিন্দিতে, সেগুলোকে শুধু বাংলায় ডাবিং করে চালিয়ে দাও।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নিল নীরা, হিমেল হাওয়ায় মুক্তির গন্ধ। ও এখন মন দিয়ে রাতুলের সঙ্গে সংসার করতে চায় – আর কিচ্ছু না। তাই এ পাড়ার কালী-মন্দিরের পাশে বেশ নামকরা একটা স্কুলে ইংলিশ টিচারের চাকরি খালি আছে শুনে গত সপ্তাহে নিজের বায়োডেটা দিয়ে এসেছে। ভালই মাইনে, অনেক ছুটি আর সকাল আটটা থেকে বেলা তিনটে অবধি স্কুল – আর কী চাই? রেলিংটার গা থেকে সরে এসে বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারটায় বসল। টেবিলে উল্টে রাখা বইটা তুলে একটু নাড়াচাড়া করল। বাইরের জানালা দিয়ে টিভির ওপর ওর আর রাতুলের গোয়ায় হানিমুনের ছবিটায় চোখ গেল। রাতুল মিত্র, দিল্লীর নামকরা একটি পি আর এজেন্সীর ভাইস প্রেসিডেন্ট, একটু বেশী মাত্রায় কাজ-পাগলা – তাই তিন বছরেই এই সংস্থার হিসাবের খাতায় দিন রাত এক করে লাভের অঙ্কে আরও গোটা তিনেক শূন্য যোগ করেছে আর তরতর করে উপরে উঠে চলেছে। জীবনে একটাই কথা মানে সে, 'দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট'।

বইটা নামিয়ে রেখে আবার রেলিং-এর ধারেই হেলান দিয়ে দাঁড়াল নীরা – মাঠের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে – ঝুপ করে অন্ধকার নেমেছে, তাই মাঠের কোণে কোণে ঘুপচি অন্ধকার।

রাতুলটা কাজ-পাগল ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে সে অন্য মানুষ – গান পাগল, বই পাগল, ঘুম কাতুরে আর পেটুক। 'আমার একটাই দোষ, মিথ্যা কথা সহ্য করতে পারি না – অ্যান্ড আই হেট লায়ারস' প্রায়ই বলে রাতুল। যেন সাবধান করে দেয় নীরাকে। 'বাট আই লাভ ইউ' বলেই জড়িয়ে ধরে ওকে। ওর আদরে নীরা অনেক কিছু ভুলতে শিখেছে।

মাঠের গেটে চোখ গেল। ওপরের ফ্ল্যাটের কাবেরীর বর, সমর না? ও আর একটু ঠাহর করে দেখার চেষ্টা করল। কাবেরী তো ছেলেদের নিয়ে বাপেরবাড়ি গেছে, লাখনৌ-এ, ওর বাবার বাৎসরিক। সমরের সাথে ওই বাচ্চা মেয়েটা কে? গলির মুখের বাড়িতে থাকে সুদীপা, ওর মেয়ে বুলবুলির মতো লাগল দেখতে। কিন্তু বুলবুলির সাথে তো সুদীপার কাজের মেয়েটা এসেছিল, ও তো ঘন্টাখানেক আগেই বারান্দা থেকে দেখেছে। তবে এখানে এসব খুব আছে, ছেলেমেয়েদের ওপর মা বাবাদের টানটা কেমন ছাড়া ছাড়া – নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত সবাই যে ছেলেমেয়ে বড় হয় ঝি-চাকরের হাতে।

কিন্তু নীরার বুকটা কেমন করে উঠল। বুলবুলির হাত ধরে সমর তখন পার্কের গেটের বাইরে বেরিয়ে গেছে, ওদিকটা একটু দূরে বলে কেমন আবছায়া। আবার সেই গা সিরসির করা, ঘিনঘিনে ভাবটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে; কান, গলা, কাঁধ গড়িয়ে বুকের পাঁজরের ওপরে যেন চেপে বসছে – পাকিয়ে পাকিয়ে নাভিমূল থেকে পায়ের পাতার দিকে নেমে যাচ্ছে। আবার সেই অন্ধকারটা চেপে বসছে মাথার ভিতর – নীরা জানে, এর পরে ওর খুব শীত করবে আর তারপর কুলকুল করে ঘাম বইবে।

'ব্রতিদা আর না, ব্যথা লাগে... আর না... উঃ! না! না!' ও জানে রাতুল ওকে ভালবাসে, কত ভালবাসতে চায়। ও নিজেও তো রাতুলকে আঁকড়ে ধরে সব ভুলতে চায় – ব্রতিদা, কলকাতার পুরনো পাড়া, সেই দুপুরগুলো। 'আহ, আহ... ব্রতিদা... লাগে, বড্ড লাগে...'

*****

কলিং বেলটা বেজে উঠল, নীরা চমকে উঠল। এই ভর দুপুরে কে এল? সুতির ওড়নাটা গায়ে টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, এক নজরে ঘড়িতে দেখল বেলা সাড়ে তিনটে। ইস্তিরিওয়ালা তো আসবে আরো একটু পরে, তবু বলা যায় না,

আজ হয়তো আগে এসেছে। রামসুখ কাল রাতুলের একটা টি-শার্টের কলার পুড়িয়েছে, তাকে বকতে উদ্যত হয়ে দরজাটা খুলে থমকে গেল। হাতে একটা কাপড়ের ন্যাপকিন ঢাকা প্লেট, আর সেই প্লেটের মালকিন কাবেরী একগাল হেসে ওকে ইচ্ছে করে একটু ধাক্কা মেরে ওর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

- 'বাব্বা, অমন রাগী মুখ নিয়ে কার জন্য দরজা খুলছিলি? রাতুলের তো ফিরতে এখনও অনেক দেরী?' ঠাট্টার সুরে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে সোফায় গিয়ে গা ঢেলে দিল কাবেরী।

- 'আরে, সে রকম কিচ্ছু নয়! রামসুখ কাল রাতুলের একটা বাড়িতে পরার টি-শার্টের কলার পুড়িয়েছে, সেটা তার অতি প্রিয়, অস্ট্রেলিয়া থেকে বোধহয় তিন বছর আগে এনেছিল; পরে পরে রঙ জ্বলে ভূত হয়ে গেছে, এখনও সেটার মায়া ত্যাগ করতে পারেনি!'

- 'ভাল রে, পুরনো জামা ফেলে দিতে যার এত কষ্ট, সে তার নতুন বউকে কত ভালবাসে বল তো? এই রকম ছোট ছোট কথা দিয়েই তো মানুষ চেনা যায়। দেখিস না আমার বরকে, মা বলতে অজ্ঞান, তাই ছেলেদের মাকেও ফেলতে পারে না।' কাবেরী হেসে প্লেটের থেকে ন্যাপকিনটা সরিয়ে, ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'লাখনৌ থেকে তো কিছু আনিনি তোর জন্য, আজ বিল্টু আর বুবুর জন্য ব্রেড রোল বানিয়েছি, তোর জন্যও নিয়ে এলাম।'

নীরার এই সাবলীল সোজা মানুষটাকে বেশ ভাল লাগে। এই বাড়িরই তিন তলায় স্বামী সমর চৌধুরী, দুই ছেলে বিল্টু আর বুবু আর একটা জার্মান শেপার্ড, ঝুপুকে নিয়ে সুখী সংসার। গত মাসখানেক কাবেরী ছিল না বলে তিন তলাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত – শুধু মাঝে মাঝে সন্ধ্যার মুখে অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজটা – কথাটা মনে হতেই কাবেরীকে সোফায় ছেড়ে নীরা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিল। 'সঙ্গে একটু চা করি? তবে তোমার মতো আদা চা-টা করা এখনও রপ্ত হয়নি আমার।' সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল কাবেরী।

- 'দাঁড়া, দাঁড়া! আমি করব! কিন্তু এই লাস্ট বার! কাল বিকেলে তোর টার্ন, আমাকে চা করে খাওয়ানোর। আচ্ছা, আমাকে কিন্তু ঠিক পাঁচটায় যেতে হবে। কাল স্কুল খুলবে, তার আগে নবাব পুত্রদের চুল কাটাতে হবে' – সাবলীল সুরে কথা বলতে বলতে কাবেরী রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। নীরার রান্নাঘরে কোথায় কী থাকে তা কাবেরীর নখদর্পণে, যে কেউ দেখলেই বলবে যে তার এ বাড়িতে অবাধ বিচরণ।

রাতুল গত চার বছর ধরে দিল্লীতে, আর ততদিন ও এই ফ্ল্যাটেই আছে। নীরাই এ বাড়িতে নতুন সংযোজন। আট মাস আগে প্রথম যেদিন নীরা রাতুলের সাথে এ বাড়িতে এল, সেদিন এক তলার মিত্র মাসিমা, তাঁর দুই মেয়ে আর কাবেরী ওকে বরণ করে ঘরে এনেছিল। মেসোমশাই আর মাসিমার সাথে ওদের আর যাই হোক ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার সম্পর্ক নয়। মাসিমার মেয়েরাও যখন বাপেরবাড়ি আসে নীরার মনে হয় ওর ননদ এসেছে। নীরা ভাল আছে, ভালই থাকবে ও জানে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। এবার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

নিজের মনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে কাবেরীর দিকে মন দিল।

- 'আমার ইন্টারভিউ কল এসেছে স্কুলে, জানো? একটু ভয় করছে – ইন্টারভিউ দিয়ে তো আসি। রাতুল ইজ ভেরী এক্সাইটেড!'

সমর, বুলবুলি, কয়েকটা সন্ধ্যায় ওদের তিন তলার বন্ধ জানালা ভেদ করে ভেসে আসা একটা মৃদু গোঙানি। কাকেই বা বলবে সে এসব কথা? আর তার ফলই বা কী হবে? বুলবুলির কী হবে? আর কাবেরী? সব কিছু তুলে রাখল আরেক দিনের জন্য। হয়তো রাতুলকেই বলবে ও – সব কথা।

*****

- 'ব্রতিদা, আর না! না! খুব লাগে! তুমি কথা শুনছ না কেন? ব্রতিদা, নাহ! উফ, না!'

- 'সোনা মেয়ে, আর একটু – তারপর আর ব্যথা লাগবে না' সেই ফিসফিস গলার আওয়াজ। ভেজা, তপ্ত ঠোঁটের নোংরা ছোঁয়া।

- 'আর একটু, আর একটু... ব্যস... চুপ, চুপ... আরো আদর করব...' আবার সেই গলাটা – 'মনে আছে, এটা আমাদের খেলা? মনে থাকবে? আওয়ার লিটিল সিক্রেট? কাউকে বললে কিন্তু সবাই তোকে খুব বকবে, মা আর বাবা তোকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবে। কাকে মা বলবি তখন? কাউকে বলবি না তো? প্রমিস?'

- 'নীরা! নীরা!' অনেক দূর থেকে রাতুলের গলা ভেসে এল দুঃস্বপ্নের মধ্যে...

- 'ব্রতিদা? হু ইজ হী? হু ইজ ব্রতিদা, নীরা?' রাতুল ওকে ঝাঁকাল এবার। 'কী হয়েছে তোমার? হোয়াই আর ইউ

সোয়েটিং? কী হ’ল?’

নীরা জানে রাতুল মিথ্যাকে ঘেন্না করে। আর ও তো সত্যি বলতে পারবে না। রাতুল তো ওকে ঘেন্না করবে। যেমন ও নিজে নিজেকে ঘেন্না করে এসেছে। ঘুমের জাল ছিঁড়ে ও ধড়মড় করে উঠে বসল। আচ্ছন্ন অবস্থাটা মানুষের সবথেকে দুর্বল সময়। চোখ রগড়ে ও ঘুমটা তাড়াতে চেষ্টা করল।

- ‘জল দেব?’ রাতুলকে বেশ চিন্তিত দেখাল। ‘আজ প্রথমবার নয়, আগেও অনেকবার তোমায় এই রকম গোঙাতে শুনেছি। আই কুড নেভার মেক আউট হোয়াট ইউ সেড। কী হয়েছে নীরা? ইউ সাউন্ডেড লাইক ইউ ওয়ার ইন এ লট অফ পেইন! আই অ্যাম কনসার্নড!’

- ‘কিছু না; মাস্ট হ্যাভ বিন অ্যা ব্যাড ড্রীম, শুয়ে পড়ো, প্লীজ।’ নীরা আবার এলিয়ে পড়ল বিছানায়। ‘আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো না, আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই, প্লীজ।’

*****

- ‘আমার কিছুই বলার নেই। এখন তো জানোই কী হয়েছিল, ব্রতিদা কে, কেন আমরা পুরনো পাড়া ছেড়ে চলে এসেছিলাম সল্টলেকের নতুন বাড়িতে? আমায় একটা কথা শুধু বলো, মা বাবাকে ফোন করে সব না জানলে জীবনে ঠকে যাবে মনে করেছিলে, না?’

রাতুল চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠান্ডা গলায় বলল, ‘অন্তত ওঁদের এই কথাটা লুকোনো উচিত হয়নি। মিথ্যা বলে...’

- ‘মিথ্যা বলে তোমাকে একটা এঁটো, ছিবড়ে গছিয়ে দিয়েছে, তাই না? কী বলত তোমাকে? যে – তাদের অজান্তে তাদেরই আট বছরের মেয়েকে তারই পঁচিশ বছরের পাড়াতুতো দাদা এক মাস ধরে যেদিন ইচ্ছে হয়েছে সেদিনই ছিঁড়ে খেয়েছে? তার ব্যথা যন্ত্রণা না শুনে তাকে ব্রুটালি রেপ করেছে? আবার ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে? জানার পর কী করতে পেরেছিল তারা? ব্রতীন্দ্রকে ধরে আমার বাবা সপাটে থাপ্পড় মেরেছিল – ব্যস, তারপর মুখ লুকিয়ে ও পাড়া থেকে চলে যেতে হয়েছিল আমাদের! ব্রতীন্দ্র রায় আজও শ্যামবাজারের একই গলিতে সুখে ঘরসংসার করছে – সে খবর পেয়েছ? আর আমার রেপের গল্প জানলে কী করতে? দয়া করে আমাকে উদ্ধার করতে? যাতে তোমার কাছে আমি দাসী হয়ে থাকতাম? নাকি আমাকে না বিয়ে করে একটা ভার্জিন জোগাড় করতে?’

******

- ‘নীরাদি, তুমি বছর খানেক আগে সি আর পার্কে থাকতে, না? কোন ব্লকে গো?’’ ঝুমকি খবরের কাগজ হাতে হন্তদন্ত হয়ে নীরার ঘরে এসে ঢুকল।

- ‘কেন রে?’ ক্লান্ত গলায় নীরা জানতে চাইল। এখনও কোনভাবেই ওর মনের ঘা-টা শুকোয়নি। প্রায় এক বছর পর সবকিছু ছেড়ে, সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করে চলেছে নীরা। সেদিন রাতুলের কোনও কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি নীরা। দুটো ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ওরই কলেজের এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। স্কুলের চাকরির ইন্টারভিউ ভাল হলেও বি-এড ডিগ্রি নেই বলে চাকরিটা পায়নি। অগত্যা দিল্লীরই একটা মাঝারি অ্যাড এজেন্সীতে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের চাকরি নিয়ে, হাউজখাসে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে আরও তিনটি মেয়ের সাথে থাকে। সবাই জানে ও আর রাতুল আলাদা থাকে। কেন, সেটা জানাবার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি।

- ‘জে ব্লকের একজন ‘সম্ভ্রান্ত’ ভদ্রলোক, সমর চৌধুরী, পাড়ারই দুটো বাচ্চা মেয়েকে গত দু’ছর ধরে রেপ করে চলেছে – কাল ধরা পড়েছে! তুমি কোন ব্লকে থাকতে? তোমার হাজব্যান্ড... মানে...’ ঝুমকি প্রশ্নটা চেপে কাগজটা নীরার বিছানার ওপর মেলে ধরল।

খবরটা দেখিয়ে বলল, ‘এই যে! এসব লোকগুলোকে জেলে না পাঠিয়ে গুলি করে মারতে হয়।’ আজ অনেক দিন বাদে নীরার বুকটা একটু যেন হালকা হ’ল। কেউ তো শাস্তি পাবে। বুলবুলির কচি মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তারপর কাবেরীর মুখটা মনে পড়তেই ওর দুচোখ ফেটে জল এল।

সন্ধ্যার মুখে রাতুলের ফোনটা এল।

অর্ডি-নারী

সুজয় দত্ত

জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টির দেখা নেই অনেকদিন। বিরাট লেকচার হল্-টার গোটা ছয়েক আদ্যিকালের সিলিং ফ্যানের সাধ্যি নেই সে-গরমের মোকাবিলা করে। তবু তারা একটানা যান্ত্রিক শব্দে চেষ্টা করেই চলেছে। একঘর তরুণ-তরুণী বসে বসে ঘামছে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মুক্তির আশায়। কেউ কেউ বিরক্ত মুখে খাতায় আঁকিবুকি কাটছে, কারো কারো চোখ আধবোজা কিন্তু নেহাত সামনে বসেছে বলে ঘুমোতে পারছে না, আর পিছনের দিকে যারা বসেছে তাদের তো পোয়াবারো – ঘুম-আড্ডা-খুনসুটির অবাধ লাইসেন্স। এরই মধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি সজাগ, প্রখর মনঃসংযোগ। না, ক্লাসঘরের সামনের দিকের দেওয়ালে বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চক দিয়ে যে ইনভার্টিব্রেট অ্যানাটমির সচিত্র বিবরণী লেখা চলছে অনেকক্ষণ ধরে, সেদিকে নয়। অন্য অ্যানাটমিতে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সালোয়ার কামিজের চল তখনো হয়নি, সাবেকী শাড়ীই একচেটিয়া। ক্লাসঘরের লম্বা লম্বা কাঠের বেঞ্চিগুলোয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকা সেই শাড়ী-গুলোতে আটকে যাচ্ছে উৎসুক কিছু চোখ, আর কল্পনা শাড়ী ভেদ করে পাড়ি দিচ্ছে আরো গভীরে।

স্নাতকোত্তরের এই ক্লাসটা ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ার মিলিয়ে। আমার মতো ফার্স্ট ইয়ার মাস্টার্সের ছাত্রই বেশী, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের যাদের চিনি, তাদের মধ্যে শৌভনিককে দেখতে পাচ্ছি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দু'সারি সামনে বসে থাকা ঐন্দ্রিলার দিকে। এদের রোম্যান্সটা এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সর্বজনবিদিত। দুজনেই অবস্থাপন্ন পরিবারের একমাত্র সন্তান, দুজনেই দারুণ শৌখীন। তাই মিলেছে ভাল। আমার বাঁদিকে পাঁচ সীট দূরে মস্তানমার্কা চকরাবকরা শার্ট আর একমুখ দাড়িঅলা প্রসেনজিৎ মাঝেমাঝেই আড়চোখে চোরা দৃষ্টি হানছে ওর থেকে অনেকটা কোণাকুণি দূরত্বে বসে থাকা স্মার্ট চেহারার প্রিয়দর্শিনীর দিকে। ক্যাম্পাসের এক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-নেত্রী ওরা, সবাই একডাকে চেনে। আর আমার ঠিক পিছনের সারিতে মাঝখানের সীটটায় উদ্দীপ্ত ওর জনি ডেপ-স্টাইলের রোমিও-রোমিও মুখ নিয়ে ডানপাশে বসা একমাথা কোঁকড়া চুলের লাবণ্যময়ী মৌমিতার সঙ্গে ক্রমাগত নীচুস্বরে কথা বলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনে মনে জানে যে এ-মাছ বঁড়শিতে গাঁথা সোজা নয় – অনেকে ছিপ ফেলে বসে আছে এর জন্য।

আমি বসেছি ডানদিকে একদম দেয়ালের ধারে, একটু পিছনে। এমনিতে রোজ সামনের দিকেই বসি, চোখে উঁচু পাওয়ারের চশমা নিয়ে যাতে বোর্ড দেখতে অসুবিধে না হয়; কিন্তু আজ লাইব্রেরীতে বইগুলো ফেরত দিয়ে ক্লাসে আসতে একটু দেরী হওয়ায় জায়গা পাইনি, ঠাঁই হয়েছে একধারে। এখানে বসলে ব্ল্যাকবোর্ডের একটা অংশ থামে ঢাকা পড়ে যায়। গলা উঁচু করে মাথা এদিক ওদিক হেলিয়ে নোট নেওয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় হাতের পেনটা হাত ফস্কে মেঝেতে পড়ল। অডিটোরিয়াম স্টাইল ঢালু মেঝে, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে সামনের দিকে। পেন গড়গড়িয়ে সিঁড়ি টপকে টপকে সেদিকে যাচ্ছে আর আমি দেয়ালের গা ঘেঁষে তার পিছু ধাওয়া করছি। যেতে যেতে বেশ কয়েকটা বেঞ্চের সারি পেরিয়ে হঠাৎ একটা কিসে যেন আটকে গেল ওটা। দেখি কারো একটা বইখাতা ভরা ঝোলাব্যাগ সীটের পাশে মেঝেতে রাখা। আমি হুড়মুড়িয়ে ওটার ওপর গিয়ে পড়ায় ছিটকে গেল বেশ কয়েক হাত। তাড়াতাড়ি ওটা কুড়িয়ে যার ব্যাগ তাকে দিতে গিয়ে মুখোমুখি দেখলাম মেয়েটাকে। সেই প্রথমবার।

নাঃ, নজরে পড়ার বা নজর কাড়ার মতো কিছুই নেই ওর। না আছে চোখজ্বালানো রূপ, না আছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো বেশভূষা বা আভরণ। একটা আলগা শ্রী অবশ্য আছে প্রসাধনহীন মুখটায়। চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর ছোটখাটো চেহারাটা আরোই কুঁকড়ে গিয়ে আবার লেখায় মন দিল। আর তখনই ওর সামনের খোলা খাতাটা এক ঝলক দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হলাম আমি। হাতের লেখাটা মুক্তোর মতো বললেও কম বলা হয়।

আচ্ছা, জুলজির ক্লাস করছি যখন, আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু একজন অচেনা সহপাঠিনীকে প্রথমবার সামনাসামনি দেখে তার যা বিবরণ দিলাম, তাতে বিজ্ঞানীসুলভ কাঠখোট্টা মূল্যায়ণের বদলে একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৌন্দর্যপিয়াসী মনের পরিচয়ই বেশী ছিল না? থাকবেই তো। ভেতরে ভেতরে আমি যে দুটোই। শিল্পী এবং সাহিত্যিক। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াটা

তো স্রেফ বাড়ীর চাপে। অথবা হয়তো বলা ভাল আমি শিল্প-অভিলাষী এবং সাহিত্যপ্রয়াসী। সোজা কথায়, আমি লিখি আর ছবি আঁকি কিন্তু আমার সৃষ্টিরা সব অসূর্যম্পশ্যা। তারা কেউ আমার টেবিলের ঘুপচি ড্রয়ারগুলোর বাইরে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেনি। কোথাও কোনো প্রদর্শনী হয়নি আমার ছবির, কোনোদিন কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি আমার গল্প। কিন্তু তাতে কী? আমাদের বাড়ীর বাগানের রঙ্গন গাছটা কি রোজ ফুল ফোটায় কোনো প্রদর্শনীতে দেওয়ার জন্য? আমাদের পাঁচিলের ধারের সবুজ গাছগাছালিতে নিত্যদিন যে পাখীরা গাইতে আসে, তাদের গ্রামোফোন কম্পানী থেকে ক্যাসেট বেরোয় না বলে কি গান গাওয়া বৃথা? আসলে ওদের জন্মই যে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য! আমি মনে করি – মানে মাঝে মাঝে মনে করতে ভাল লাগে আরকি – যে আমারও তাই। স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতার মধ্যে যে একটা নান্দনিক তৃপ্তিবোধ মিশে থাকে, তার রসে একবার মজলে মন আর কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পরোয়া করে না, এই সার কথাটা আমি বুঝে গেছি। আমার কাছে সেই পরম তৃপ্তিবোধই হ'ল অমৃত। বাকী সব অমৃতি। এ-জীবনে নামীদামী মিষ্টির দোকানের পাঁচ টাকা পিস্ দশ টাকা পিস্ অমৃতি চাখতে না পাই তো বয়েই গেল। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি বলে "খুব তো বড় বড় কথা। বাবার হোটেলে খেয়ে বাবার পয়সায় কলেজে পড়তে পড়তে শখের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে ওসব অনেক কিছুই কপচানো যায়। যদি এঁকে-লিখে পেট চালাতে হতো তখন?" সেই কথাটা অবিশ্যি অস্বীকার করা কঠিন। জঠরানল তো কত অসীম প্রতিভাধর স্রষ্টাকেও এই পৃথিবীর ধুলোকাদামাখা বাজারে ফুটপাথের ফেরিওয়ালা বানিয়েছে। সেখানে আমি ব্যতিক্রম হতাম কিসের জোরে?

এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি পরে পেয়েছিলাম কমলপ্রিয়ার কাছে। মানে ওর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে যাওয়ার পর শিখেছিলাম ওর কাছে। কমলপ্রিয়াটা আবার কে? কেন, সেদিনের সেই জুলজি ক্লাসের কোণের দিকে দেয়ালের ধারে বসে থাকা সাদামাটা লাজুক মেয়েটা? আসলে হয়েছিল কী, সেদিনের সেই আচমকা চোখাচোখির পর একটু কৌতূহল জেগেছিল ওর সম্বন্ধে আমার মনে। নানারকম প্রশ্ন। ও সবসময় এত চুপচাপ কেন? ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া আর বাড়তি এক মুহূর্ত ক্যাম্পাসে থাকে না কেন? সহপাঠী বা পাঠিনীদের সঙ্গে মেলামেশা আর হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপারে এত কুণ্ঠিত কেন? ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের উপেক্ষা ওকে বিচলিত করে না কেন? এই বয়সের একটা মেয়ে এত নিরাভরণ কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, তারপর থেকে জুলজি ক্লাসে সেই শৌভনিক-প্রসেনজিৎ-উদ্দীপ্তর মতো আমারও চোখ বারবার ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সরে যায় আর মন অন্যদিকে চলে যায়। দুটোই গিয়ে আটকায় ক্লাসঘরের সেই কোণে যেখানে একজন উদাসীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখায় নিঃশব্দে নোট নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে রহস্য যতই জমাট বাঁধে বুকের মধ্যে, তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটাও ততই তীব্র হতে থাকে। কিন্তু উপলক্ষ্য? উপলক্ষ্য চাই তো একটা। নিদেনপক্ষে কোনো অজুহাত। তখন তো আর আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো লিঙ্গের তোয়াক্কা না করে অপরিচিতের দিকে "নাইস মিটিং ইউ" বলে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চল ছিল না।

যাইহোক, একদিন একটা অজুহাত হঠাৎ নিজে থেকেই এসে হাজির। অফিস টাইমের একটা প্রচন্ড ভীড় বাসের পাদানিতে ঝুলে ঝুলে কলেজ যাচ্ছিলাম, আচমকা ঠেলাঠেলিতে হাত ফস্কে আছড়ে পড়লাম এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর। ডানপায়ে দারুণ চোট, সারা গা কেটে-ছড়ে একাকার। ব্যস, এক সপ্তাহ কলেজ কামাই। আট দিনের দিন পায়ে ব্যান্ডেজ জড়ানো অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের বেশ খানিকটা আগে জুলজি ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে দেখি মেয়েটা প্রায় ফাঁকা লেকচার হলের এককোণে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়ে? আমি ওর খানিকটা পিছনে একটা সীটে ব্যাগ রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, "ইয়ে, মানে, একটা কথা ছিল..."। ও একবার আমার দিকে, তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু ঠোঁট নাড়াল, "বলুন"। যেহেতু আগে কখনো কথা হয়নি আমাদের, তুমি-আপনির ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু দ্বিধায় ছিলাম। ওর উত্তর শোনার পর আর দ্বিধার অবকাশ নেই, বললাম "আমার একটা অ্যাকসিডেন্টের জন্য সাতদিন আসতে পারিনি, এদিকে প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষাও এসে গেল, আপনার নোটখাতাটা একটু যদি পেতাম, জেরক্স করে নিতাম।" অল্পক্ষণ নীরবতার পর নীচুস্বরে জবাব এল, "ঠিক আছে। এই ক্লাসের পরে দিই?" আমার তো মন নাচছে, কিন্তু

মুখে হ্যাংলাপনা দেখানো চলবে না, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ" বলে সীটে ফিরে গেলাম। তারপর দেড়ঘন্টা ধরে ক্লাসে ঠিক কী হ'ল বলতে পারব না, কারণ কান সেসব শুনলেও মনের গ্রামোফোনে সারাক্ষণ অন্য রেকর্ড বাজছিল। একটু আগের সেই কথোপকথনের নিরন্তর রিপ্লে। তারপর ক্লাস শেষ হতে না হতেই নির্লজ্জ পাওনাদারের মতো তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে ডানহাতে বঙ্গলিপি খাতাটা বাড়িয়ে দিল। ঈষৎ শ্যামলারঙের সে-হাতে একটা চুড়িও নেই। আর খাতার ওপর মুক্তাক্ষরে নাম লেখা "কমলপ্রিয়া বায়েন"। নামটা তো দারুণ সুন্দর, কিন্তু পদবী বায়েন? এই পদবীর কারো সঙ্গে তো কোনোদিন পরিচয় হয়নি এর আগে । আমি কিছু বলার আগেই শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কাল ফেরত পেলেও চলবে।"

- "ওঃ, আচ্ছা, কী বলে যে আপনাকে –"

- "ফিজিওলজি আর বায়োকেমিস্ট্রির নোটও লাগবে কি?"

এটা তো আশা করিনি! তার মানে ওই ক্লাসদুটোতেও যে আমি আর ও একই সেকশনে, সেটা ও খেয়াল করেছে? আমার তো বহুদিন আগেই নজরে পড়েছে। তবে ওইসব ক্লাসে যেহেতু আমার বাড়ীর কাছের দু-একজন বন্ধুবান্ধবও পড়ে, নোটগুলো তাদের কাছ থেকেই নেব ভাবছিলাম। কিন্তু এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আমতা আমতা করে বললাম, "হ্যাঁ, মানে, যদি কাল ক্লাসের পর ওগুলো..."

- "আজই ব্যাগে আছে খাতাদুটো। এই যে।"

আবার প্রসারিত হয় সেই চুড়িহীন হাত। আমি কথা হারিয়ে ফেলি। হায়রে! তখন যদি মেয়েটা জানত, নিজের অজান্তে আমাকে কী দিয়ে ফেলল সেদিন – আর আমিও যদি সেই কাঁচা বয়সে বুঝতাম মাঝ-ফেব্রুয়ারীর ওই বিশেষ দিনটার পশ্চিমী তাৎপর্য। হ্যাঁ, তারিখটা ছিল চোদ্দই ফেব্রুয়ারী।

****

কোথা দিয়ে যে কেটে গেল একটা গোটা বছর, কে জানে! আজ আবার চোদ্দই ফেব্রুয়ারী। আজ রিমঝিমকে নিয়ে অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় খাওয়া, মেট্রোয় সিনেমা দেখা, লিন্ডসে স্ট্রিটে একটু কেনাকাটা। কিন্তু ওকে ওসবে রাজী করায় কার সাধ্য? ওর ভেতরের এই ঠান্ডা জেদটা, যার কাছে বারবার হার মানতে হয় আমাকে, প্রথম আলাপে মোটেই বুঝতে পারিনি। আর আজ এটার জন্যই ওকে আরও বেশী ভালবাসি। সত্যি, ও এই এক বছরে আমাকে অনেকটা বদলে দিয়েছে। আর আমি? আমি শুধু বদলাতে পেরেছি ওর ডাকনামটা। আসলে কমলপ্রিয়া নামটার প্রতি অনুরাগ আমার আরো বেড়ে গেছে, যেদিন থেকে খেয়াল করেছি আমার নিজের নামের মানেটা। আমি নীলোৎপল। তবে ওর ডাকনামটা আমার পছন্দ ছিল না গোড়া থেকেই। কুড়কুড়ি আবার একটা নাম নাকি? তাই ওটা বাতিল করে ওকে এখন ডাকি রিমঝিম বলে। সে তো হ'ল, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি ওর বিচ্ছিরি ডাকনামটা জানলাম কী করে? কলেজে তো আর কেউ ও-নামে ডাকে না। সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি। একবছর আগের সেই নোট আদানপ্রদানের দিন আমাকে অতিরিক্ত সাহায্য করতে গিয়ে যে বাড়তি নোটখাতা দুটো আমাকে দিয়েছিল কমলপ্রিয়া, তার পিছনের পাতায় ছিল একটা দারুণ চমক। সে-প্রসঙ্গ উঠলে আজও লজ্জা পেয়ে যায় ও। বাড়ী গিয়ে সেই জৈবরসায়নের খাতা উল্টে দেখি তার একেবারে শেষে মলাটের ভিতরের দিকটায় চোখ-জুড়ানো বাংলা হাতের লেখায় একটা কবিতা!

বুকের ভেতর অথৈ সাগর, চোখে জলের নদী –
ডুব দিয়ে দেখ, মনের কথা বুঝতে পারিস যদি।
ঠোঁটে আমার অষ্টপ্রহর হাসির ঝিলিক দেখে
ভাবিস বুঝি কান্না এত এল কোথা থেকে?
সবাই আমার শান্তশীতল রূপটা নিয়েই থাকে,
ভেতরে ঝড় উথালপাথাল – কে তার খবর রাখে?
তুই তো আছিস মনের দোসর, মন আছে তাই বেঁচে।
তোর তো শুনি জহুরী চোখ, দেখ না সাগর ছেঁচে –
পান্না চুনী মুক্তো মণি যা পাবি সব তোরই।
কিছুই না পাস্, ভালবাসাই উঠবে দুহাত ভরি।
সব রতনের সেরা রতন – সে ধন দেব কাকে?
তোর মতো আর কেইবা জানে আমার এ-মনটাকে?
তাই তো বলি, ডুবুরি তুই দাঁড়িয়ে কেন চরে?
আমার বুকের জোয়ারভাঁটায় দেখ না ডুবে মরে।

আর ফিজিওলজির খাতার শেষ-মলাটেও লালকালিতে লেখা –

তুমি ফুটে ওঠো দিব্যপলাশ হয়ে
আমি বসে থাকি প্রতীক্ষাতরুতলে
দখিন হাওয়ায় সমুদ্র কানাকানি
তবু কই সেই বন্ধ দুয়ার খোলে?

কতবার যে পড়েছিলাম কবিতাদুটো সেদিন, গোনা যাবে না। বার বার মনে হচ্ছিল, এটা কি সত্যিই ওই নিশ্চুপ, নির্বিকার, নিরলংকার মেয়েটার মনের কথা, না অন্য কারো? ঠিক রবিঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’ না হলেও এই শেষ-মলাটের কবিতাই বা কম কী? যাইহোক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমিও একটু অদ্ভুত টাইপের। নাহলে প্রায়-অপরিচিতা এক সহপাঠিনীর ভুল করে দিয়ে ফেলা কবিতার জবাবে কেউ তার নোটখাতাতেই আবার কবিতা লেখে? কিন্তু কী করব? আমার বুক ঠেলে উঠে আসছে যে লাইনগুলো, হাত নিশপিশ করছে লেখার জন্য, সেগুলো জোর করে চেপে রাখলে সে-রাতে ঘুমই আসবে না। লালের তলায় সবুজ কালিতে লিখলাম,

না খুলুক, তবু সুদূরের হাতছানি
তোমার অরুণরক্তিম অনুভবে।
সময় কঠিন পরীক্ষা নেয় জানি –
দেখা হবে ঠিকই বসন্ত-উৎসবে।

তারপর? তারপর আর কী? সেই নোটখাতা পরদিন সকালে জেরক্স করিয়ে ভাবলাম কলেজে গিয়ে ক্লাসে ঢোকার আগে আমার কবিতাটা কালো কালি দিয়ে কাটাকুটি করে দেব। বলব সরি, হাত থেকে একটু কালি পড়ে গেছে ওখানে। কিন্তু এমনই ভাগ্য, সেদিন কলেজের সামনে মিনিবাস থেকে নেবেই দেখি উল্টোদিক থেকে ও হেঁটে হেঁটে আসছে। সর্বনাশ! এখন তো আর বলতে পারব না খাতাগুলো তিন ঘন্টা পরে ফেরত পাবেন। নিজেকে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে হ’ল। কোনোরকমে খাতাদুটো ওর হাতে গুঁজে দিয়ে একপ্রকার ছুটেই পালিয়ে এলাম। এর পরবর্তী দিনসাতেক, মানে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার আগে অবধি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চললাম, ক্লাসে ওর থেকে যতদূর সম্ভব দূরে বসলাম। কিন্তু প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার দিন তো একই ল্যাবে দফায় দফায় আমরা সবাই। সেদিন আর পারা গেল না, একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ওর সেই শান্ত চোখের ভাষাহীন চাহনি দেখে আমার হাত কেঁপে গেল, বুনসেন বার্নারের গরম ছ্যাঁকা লাগল, কাঁচের টেস্টটিউব মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সে এক যাচ্ছেতাই কান্ড! শেষে পরীক্ষা দিয়ে কলেজের গেটের সামনে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি পিছন থেকে ও এসে দাঁড়াল রাস্তা পার হবে বলে। আমার দিকে চোখ পড়তে একটু সরে এসে নীচুগলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি নিয়মিত লেখেন?” আমি উত্তর দেব কী, গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনোরকমে মুখ দিয়ে বেরোল, “না, মানে হ্যাঁ, মানে ঠিক…। শুনে ওর মুখে কি একচিলতে বিরল হাসি ফুটে উঠল? বলতে পারব না, আমার তাকাবার সাহস হয়নি। এই সময় আমার বাসটা এসে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেই ঘটনার সময়েই প্রথম লক্ষ্য করেছিলাম যে ও দুবেলা হেঁটে যাতায়াত করে। ওর তো কোনোদিন কোনো বন্ধু-টন্ধু দেখি না যে তাকে জিজ্ঞেস করে কৌতূহল মেটাব ও কোথায় থাকে, ওর বাড়ীতে কে কে আছে, ইত্যাদি। সুরঞ্জনা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে যায় ও, কিন্তু সে তো কলাবিভাগের। তার সঙ্গে আমার মোলাকাতের সম্ভাবনা নেই। অতএব একদিন দুম করে যেটা করে ফেললাম, সেটাকে হিন্দীতে দিওয়ানাপন বললে হয়তো রোম্যান্টিক শোনাতো, কিন্তু তার বদলে বাড়াবাড়ি বা ঝুঁকিপূর্ণ বোকামি বললেও আমি আপত্তি করব না। একদিন ছুটির পর আমার এক স্থানীয় বন্ধুর সাইকেলটা ধার করলাম ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনতে যাচ্ছি বলে। আর কমলপ্রিয়া বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরতেই আমি একটু তফাতে থেকে ওর পিছু নিলাম। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, ক্রমশঃ গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ও, ভয় হচ্ছে এবার বুঝি ওকে হারিয়েই ফেলব। শেষে একটা এঁদোগলির মুখে নড়বড়ে কাঠের দরজা ঠেলে যার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর শরীরটা, সেটাকে কি ঠিক বাড়ী বলা যায়? আমি নিশ্চিত যে, রোজ বালিগঞ্জ থেকে চকচকে কনটেসায় চড়ে কলেজে আসা অনিন্দ্য রায় বা পার্ক স্ট্রীটের বিউটি পার্লারে নিয়মিত ফেসিয়াল করানো সংঘমিত্রা বাসু ওটার জন্য অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করত। কিন্তু আমি সেটা পারব না; এই জন্যে যে, খোলা জানলা আর আধখোলা দরজার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একচিলতে ঘরের সেই গোছানো সংসার। টুকরো-টুকরো কানে আসছে সদ্য-ফেরা মেয়েটাকে ঘিরে তিনটে বিভিন্ন বয়সের বাচ্চার আহ্লাদ-আবদার আর একজন রুগ্ন চেহারার অর্ধশায়িত প্রৌঢ়ার ক্লান্ত কণ্ঠস্বর। অনুভব করতে পারছি সেই ভাঙাচোরা পলেস্তারা-খসা কাঠামোটার ভেতরকার হৃদস্পন্দন। উল্টো-দিকের রাস্তাটার কিনারে খোলা নর্দমার ধারে পানবিড়ির ছোট্ট দোকান, আর তার পাশেই টালির চালঅলা চায়ের দোকান।

সেই দুয়ের মাঝে সাইকেল গুঁজে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি আর মনে মনে প্রাণপণে হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছি। নাঃ, মিলছে না, কিছুতেই মিলছে না। সেই শেষ-মলাটের কবিতার হীরে আর হাতের লেখার মুক্তোকে কিছুতেই রাখতে পারছি না সেই বিবর্ণ জরাজীর্ণ ছবিটার মধ্যে। দেখলাম একটা ফ্যাকাসে সবুজ রঙের ম্যাক্সি পরে কোলে ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে ও বাইরে আসছে বালতি হাতে। সামনেই যে অবিরাম সুতোর মতো জল পড়ে যাওয়া কর্পোরেশনের কল, সেখান থেকে বালতি ভরতে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম দোকানের পিছন দিয়ে, কিন্তু মন রয়ে গেল সেখানেই। প্রিয়ার সঙ্গে, প্রিয়ার ঘরে।

অবশ্য বেশীদিন মনকে একা একা থাকতে হ'ল না সেখানে। শরীরও গিয়ে হাজির হল অচিরেই। ঘটনাটা, কিংবা দুর্ঘটনা বলাই হয়তো ঠিক, হঠাৎই ঘটে গেল আগস্টের এক ঝমঝমে বৃষ্টির দিনে। যথারীতি একহাঁটু জল জমেছে কলেজের সামনের রাস্তায়। যানবাহন চলাচল মোটামুটি স্তব্ধ। শুধু গুটিকয় সাইকেলরিক্সা মেন গেটের কাছটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাঁও মারার অপেক্ষায়। ক্লাস-টাস শেষ হওয়ার পরেও ছাতা নেই বলে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরোতে পারছি না, বিল্ডিংয়ের ভেতরেই সেঁধিয়ে আছি। তারপর বৃষ্টি একটু কমতে মাথায় ব্যাগ চাপা দিয়ে দৌড়ে গেটের কাছে এসেই একটা রিক্সা পেয়ে গেলাম। সবে ফুট দশেক গেছে রিক্সাটা, এমন সময় সামনের ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি প্রিয়া ওই বৃষ্টি মাথায় জল ভেঙে রাস্তা পার হচ্ছে। সেই কাদাগোলা জলের নীচে কী আছে না আছে বোঝার তো কোনো উপায় নেই। যেই রাস্তাটা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠতে যাবে, সম্ভবতঃ ফুটপাথের উঁচু ধারটাতে লেগেই সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ল জলের মধ্যে, ব্যাগ-ট্যাগ সব নিয়ে। তারপর দুহাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার টাল সামলাতে না পেরে ঝপাস। আমি সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাঅলাকে গাড়ী ঘোরাতে বলে লাফিয়ে নামলাম, গিয়ে টেনে তুললাম ওকে। শাড়ী-পোশাক সব ভিজে লেপ্টে আছে গায়ে, আমাকে দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল একেবারে। বললাম, "দাও ব্যাগটা আমাকে দাও, রিক্সায় ওঠো।"

- "ন্না ন্না, আমি ঠিক..."

- "কিচ্ছু ঠিক নয়, যা বলছি শোনো, ওঠো রিক্সায়" বলে ওকে একপ্রকার ঠেলেই তুলে দিলাম। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে পাশে বসে রিক্সাঅলাকে পথনির্দেশ দিতে যাব, আচমকা মাথায় এল আরেঃ, মেয়েটা তো জানে না আমি ওর বাড়ী চিনি। নিজেকে সংবরণ করে ওকেই বললাম ওর বাড়ী কীভাবে যেতে হয় বলতে। সারাটা রাস্তা যথাসম্ভব গুটিসুটি মেরে আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ঐটুকু রিক্সায় সেটা সম্ভব নয়। বাড়ীর কাছাকাছি আসার পর ও দেখি পিচের রাস্তার মুখটাতেই নামার জন্য পা বাড়াচ্ছে। আমি বলে উঠলাম, "এখানে কেন? আরো যাওয়া যায় তো। সেই চায়ের দোকানের আগে অবধি ইজিলি –" বলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। মেয়েটা দেখি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে রইলাম। ওকে চায়ের দোকানের পাশে নামিয়ে দিয়ে আর কোনো কথা না বলে ফেরত আসছি, হঠাৎ মনে হ'ল আচ্ছা, ও কি খেয়াল করেছে আজ প্রথম "তুমি" বললাম ওকে?

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। পরের দুদিন কলেজ নেই। সোমবার আমি মলিকিউলার বায়োলজি ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, দেখি পাশের লাইব্রেরী বিল্ডিং থেকে ও সেদিকেই আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে চকিতে চারপাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি হেনে সামনে দাঁড়াল, তারপর ব্যাগ খুলে একটা কাগজের মোড়ক বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী এটা?"

- "সেদিন কত নিয়েছিল রিক্সা জানি না তো, তাই আন্দাজে..."

- "আচ্ছা, কোনো মানে হয়? আমাকে কি সত্যিই ওরকম মহাজন-টাইপ দেখতে যে..."

- "কিন্তু আমারও তো ভাল লাগা খারাপ লাগা আছে, কৃতজ্ঞতা বোধ আছে।"

- "দেখো, তুমি যাই বলো, ও আমি নিতে পারব না। কখনো সম্ভব? ঢোকাও ওটা ব্যাগে" গলায় কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা আনলাম। ও মাথা নীচু করে ব্যাগ থেকে এবার একটা খবরের কাগজের ঠোঙা বার করে বলল, "এটা কিন্তু আমি দিচ্ছি না, মা পাঠিয়েছে।"

- "মা? মানে তোমার মা? তিনি তো আমাকে চেনেনই না!" বিস্মিত হই আমি।

- "তাতে কী? আমি তো চিনি। আমি বলেছি। এটা না নিলে কিন্তু..."

হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিয়ে দেখি কয়েকটা নরম পাকের নারকেল নাড়ু। মনটা একটা অদ্ভুত ভাল লাগায় ভরে গেল, ওর

চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম, "সরি, বিনা শর্তে নিতে পারছি না। একটা শর্ত আছে।"

- "কী?"

- "যিনি এটা দিচ্ছেন আমাকে, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে বলে আসতে চাই কেমন লেগেছে। রাজী?"

শুনে বেশ একটু অপ্রস্তুত দেখায় ওকে, সামলে নিয়ে বলে, "কেমন লাগল সেটা তো একটা চিঠি লিখেও জানানো যায়। আমি পৌঁছে দেব।"

- "তার মানে? আমি বড়মুখ করে বললাম তোমার বাড়ী যাব আর তুমি – তাহলে থাক এটা" বলে কপট অভিমান দেখিয়ে ঠোঙাটা প্রত্যর্পণ করি ওর হাতে। ঠিক এই সময় আমাদের ক্লাসের একদল ছেলেমেয়ে হৈহৈ করে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে আমাদের দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল। বায়োফিজিক্সের সায়ন্তন ফিচেল হাসি হেসে বলে উঠল, "সরি, তোদের প্রাইভেট কনভার্সেশন মাটি করে দিলাম। আমরা সামনের মাসের ইন্টার-কলেজ কালচারাল ফেস্টের টিম সিলেকশন নিয়ে মিটিং করতে যাচ্ছি। তুইও তো কমিটিতে আছিস।"

আমি আর কী করি, সত্যিই কমিটিতে নাম লিখিয়েছি, এড়ানো গেল না। প্রিয়া মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই।

সেদিন মলিকিউলার বায়োলজি আর ফাইটোকেমিস্ট্রির পরপর দুটো ল্যাব সেরে বাড়ীমুখো হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটি চত্বর প্রায় ফাঁকা। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে মেন গেটের দিকের রাস্তাটা সবে ধরেছি, দেখি সামনেই সিমেন্ট-বাঁধানো গাছতলাটায় কে একটা বসে আছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল। আরেঃ, এ যে প্রিয়া! অবাক হয়ে বললাম, "কী ব্যাপার? এইসময় এখানে? তোমার লাস্ট ক্লাস তো ছিল চারটেয়?"

- "আমি কিন্তু তখন ঠিক ও-কথা বলতে চাইনি।"

- "কোন কথা?"

- "সবই তো জানেন, কোথায় থাকি, কীভাবে থাকি। নতুন করে লুকোবার তো কিছু নেই আপনার কাছে, তাই..."

- "ওঃ, সেই বাড়ী যাবার ব্যাপারটা? আরে আমি মজা করছিলাম একটু। সবকিছু এত সিরিয়াসলি নিলে চলে?"

এবার আমার দিকে এগিয়ে আসে সেই পরিচিত আভরণহীন হাত। বাড়িয়ে ধরে খবরের কাগজের ঠোঙাটা। সত্যি বলতে কি. সারাদিনের ব্যস্ততায় আমি ভুলেই গেছিলাম নারকেল নাড়ুর প্রসঙ্গ। বললাম, "তার মানে তুমি স্রেফ এটা দেবার জন্যই এতক্ষণ বসে ছিলে এখানে?"

কেঁপে ওঠে ঠোঁটদুটো, ভেজা গলায় প্রশ্ন আসে, "বলুন কবে আসছেন আমাদের বাড়ী?" একটু দূরের ল্যাম্পপোস্টটার আবছা আলোয় দেখি কমলদীঘিতে দুফোঁটা জল টলটল করছে, উপচে পড়ল বলে। জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ভালমন্দ উচিত-অনুচিতের সব হিসেবনিকেশ এক লহমায় ভেসে যায় কোনো এক পরম পাওয়ার হাতছানিতে। কী যে হয়ে গেল আমার, ওর বাড়ানো হাত ধরে কাছে টেনে নিলাম ওকে। আলতো করে চোখের জল মুছিয়ে বললাম, "যাব, যে-মুহূর্তে এই 'আপনি' বলাটা ছাড়তে পারবে, তক্ষুণি যাব।" এই প্রথম এভাবে কোনো স্বল্পপরিচিতার তপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাসে চঞ্চল হয়ে উঠল শরীর। ও-ও দেখলাম কেঁপে কেঁপে উঠছে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম পরস্পরের আলিঙ্গনে সেই নির্জন রাস্তায়, জানে শুধু সেই প্রাচীন বটগাছ আর ল্যাবরেটরি বিল্ডিংয়ের গেট জড়িয়ে ওঠা মাধবীলতার ফুলগুলো।

সেদিনই প্রথম ও নিয়ে গেছিল ওর বাড়ীতে, আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওর মায়ের সঙ্গে। ওঁর মুখেই শুনি প্রিয়ার সেই অ-কাব্যিক ডাকনামটা। তার আগে পথে যেতে যেতে শুনেছিলাম সেই ভয়ঙ্কর কথাটা – অ্যাডভান্সড স্টেজ প্যাংক্রিয়াটিক ক্যান্সার ভদ্রমহিলার। ছড়িয়েছে শরীরের অন্যত্রও। ধরা পড়েছে অনেক পরে। আর এরপর সেই দেড়-কামরার ঘরে পৌঁছে আরও যা যা দেখলাম-জানলাম, মন একেবারেই তৈরী ছিল না তার জন্য। আমার সেই লুকিয়ে লুকিয়ে সাইকেলে পিছু নেওয়ার দিন যে তিনটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখেছিলাম, তারা আসলে ওর ভাইবোন নয়। ও নিজে প্রাণপণে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল সপ্তাহে ছদিন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অতটা সময় কাটানোর পর প্রতি শনি-রবিবার ও যায় কাছেই গাঙ্গুলিবাগানের পুরনো পল্লীর বস্তিতে। সেখানে একটা অনাথাশ্রমে শিশুদের পড়ানো আর দেখাশোনার স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার সূত্রেই ওই তিনটে বাচ্চাকে প্রথম দেখে ও। অচিরেই ভীষণ ভালবেসে ফেলে ওদের, আর ওরাও ক্রমশঃ ওকে ছাড়া থাকতে পারে না। তারপর হঠাৎ একদিন

অনাথ আশ্রমটা বন্ধ হয়ে যেতে ওদের এখানে চলে আসা। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা প্রথম দর্শনেই আমার মধ্যে কী পেলেন জানি না – প্রাণ খুলে গল্প করতে লাগলেন। বললেন আগে ওঁরা এখানে থাকতেন না। প্রায় এক দশক আগে ওঁর প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করা স্বামী হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ায় আর দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় পাননি। স্বামীর সঞ্চয় বলে কিছু ছিল না, সামান্য কিছু পেনশন পান। মেয়ে আগাগোড়াই তার কলেজে পড়ার খরচ নিজে চালিয়েছে টুইশন পড়িয়ে আর একটা সরকারী স্বনির্ভরতা প্রকল্পে মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে। মানে সেলাইফোঁড়াই, তুলোর পুতুল আর পুঁতির গয়না তৈরী করা। সে নিজে ওসব শিখল কোত্থেকে? কেন, মায়ের কাছ থেকে? এককালে শরীরে যখন ক্ষমতা ছিল, স্বামীর অস্বচ্ছল সংসার তো তিনি ঐসব করেই টানতেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয় প্রিয়ার চমক। ঘরের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু দারুণ দারুণ ক্রোশের কাজ আর এম্ব্রয়ডারী। চুন-খসা দেওয়ালেও পেরেক দিয়ে টাঙানো কয়েকটা। আর পাথুরে মেঝের এককোণে অপূর্ব আল্পনা আঁকা। কেন? এখানে কি পুজো-টুজো হয় নাকি? না না, ওগুলো স্রেফ মেয়ের শখ। নিজে নিজেই শিখেছে, খুব ভাল হাত। মনে মনে ভাবলাম, হ্যাঁ, সে তো হবেই। ক্লাসের সব নোটখাতা জুড়েই তো রয়েছে শৈল্পিক হাতের নমুনা। ক্রোশে আর এম্ব্রয়ডারী অবশ্য শিখেছিল স্কুলের সেলাই দিদিমণির কাছে। আপাদমস্তক শখ-আহ্লাদহীন মেয়েটার ঐটুকুই একটু নেশা। ওকে জিজ্ঞেস করি, "এগুলো কখনো কোনো বুটিকের দোকানে বা সরকারী হস্তশিল্পের আউটলেটে বিক্রীর চেষ্টা করোনি?" উত্তর আসে, "সেরকম কোনো জানাশোনা তো নেই। তাছাড়া জীবনে সব জিনিস কি বিক্রীর জন্য?"

- "তা ঠিক। যেমন তোমার কবিতা। কী, তাই তো?।

শুনে লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয় ও।

****

সেই ক্রোশে, এম্ব্রয়ডারী আর রঙ্গোলির গুঁড়ো রং দিয়ে আঁকা চোখজুড়ানো সব আল্পনা এখন আমার শহরতলীর ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আলো করে রেখেছে। যেমন রেখেছে ওগুলোর স্রষ্টা। বছর তিনেক হ'ল আমরা দুজন ভাড়া নিয়েছি এটা, সংসার পেতেছি এখানে। দুজনেই অনেক কিছু হারিয়ে তবে পেয়েছি এই ভালবাসার নীড়। সাড়ে চার বছর আগের সেই প্রথম আলাপের ন'মাস পরেই মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই শেষ হয়ে গেছিল প্রিয়ার মা'র। তাঁকে আর আমার মা করে নিতে পারিনি। আর আমার নিজের মা তো থেকেও নেই। বাবাও। বছর চারেক আগে যখন প্রথম বাড়ীতে বলি প্রিয়ার কথা, আর ওকে নিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা, আকস্মিকতার আর তীব্র আশাভঙ্গের সেই শক সহ্য করতে পারেনি ওরা কেউ। বাবা-মা-দাদা কেউ না। আজও মনে পড়ে সে রাতে তীব্র বাকবিতণ্ডার পর নিজের বিছানায় সারারাত জেগে বসে ভাবছিলাম, এর পরের সিনটা কি সেই পরিচিত বাংলা সিনেমাগুলোর মতো হবে, না নতুন কিছু? আমার মনে অবশ্য প্রিয়াকে নিয়ে সেই মুহূর্তে কোনো দোলাচল ছিল না, ওকে তো আমার জীবনের অংশ করেই ফেলেছি। প্রশ্নটা ছিল অংকের আর সময়ের। দুজনেই সদ্য মাস্টার্স শেষ করে বেরিয়েছি তখন। ওর মায়ের চূড়ান্ত যন্ত্রণাময় অন্তিম দিনগুলো ওকে এমন গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছিল যে একসময় বলছিল ফাইনাল পরীক্ষায় বসবে না। অনেক বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। তবে রেজাল্ট ততটা ভাল হয়নি। আর আমার ভাল ফল হলেও আত্মনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ তখনও নেওয়া বাকী। অর্থাৎ চাকরি। তাই আমার এত বছরের পরিচিত পরিবেশ আর জীবনটাকে ছেড়ে আসতে একটু প্রস্তুতির দরকার ছিল। ওকে যখন জানালাম বাড়ীর প্রতিক্রিয়া আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কী করতে চলেছি, ও অনেকক্ষণ চুপচাপ মাথা নীচু করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, "এত চড়া দাম দিয়ে কী কিনছ বলো তো নীল? এভাবে নষ্ট করবে জীবনটা?" আমি ওর চোখে চোখ রেখে হেসে জবাব দিলাম, "নষ্ট করতাম না, কিন্তু একদিন আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল – জীবনে সবকিছু কি বিক্রীর জন্য?" শুনে বাঁধভাঙা কান্নায় ভিজিয়ে দিয়েছিল আমাকে মেয়েটা সেদিন।

তারপর? তারপর আর কী? কয়েকটা বায়োটেক স্টার্টআপ কম্পানীতে ব্যর্থ আবেদনের পর অবশেষে একটা মোটামুটি নামী প্রাইভেট কলেজ থেকে লেকচারারশিপের ইন্টারভিউয়ে ডাকল যেদিন, সেদিন সত্যিই ভাবিনি চাকরিটা পেয়ে যাব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বাসা খোঁজা শুরু, আর মাস তিনেকের মধ্যেই এই ছোট্ট দুকামরার ফ্ল্যাট। আমার চাকরির খবর পেয়ে খুশী হতে পারেনি বাড়ীর কেউ, কারণ ওরা জানত এটা কিসের

সংকেত। শুধু বৌদি চুপি চুপি একদিন "কংগ্র্যাচুলেশন্স, বাবলু" বলে হাতে জোর করে দুশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল। ফ্ল্যাটটাও আমি আমার বাড়ীর সবাইকেই দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উৎসাহ দেখিয়েছিল শুধু বৌদি। চোখ টিপে বলেছিল, "শুধু ফাঁকা ফ্ল্যাট দেখলে চলবে বুঝি? যে থাকবে, তাকে দেখব না?" উত্তরে শুধু ছবি দেখিয়েছি, কারণ প্রিয়াকে এ-বাড়ীতে আনার প্রশ্নই নেই। ফ্ল্যাটের কাগজপত্র সই করে প্রিয়ার সেই গলির গলি তস্য গলির একচিলতে মাথা গোঁজার ঠাঁইকে টা টা বাই বাই বলে ওকে নতুন জায়গায় এনে তোলার পর একদিন দেখি আমাদের চমকে দিয়ে বৌদি নিজেই হাজির একগাদা উপহার আর মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে। বলল আজ ওর স্কুলে স্পোর্টসের ছুটি, তাই পড়ানো নেই, কিন্তু বাড়ীতে সেকথা না বলে সরাসরি এখানেই চলে এসেছে। প্রিয়াকে দেখে, ওর অতীতের গল্প শুনে, ওর কাজকর্ম সম্বন্ধে জেনে চোখ ছলছল করছে দেখলাম বৌদির। যাওয়ার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমায় বলল, "এ বাড়ীতে বিয়ে হয়ে আসা অবধি তোকে কোনোদিন এত ম্যাচিওর ভাবিনি রে বাবলু। ভাগ্যিস এলাম আজ। বুকটা ভরে গেল তোদের দুটিকে দেখে।" আর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বাসে ওঠার ঠিক আগে বলে গেল, "অন্যলোকে যে যাই করুক, তুই তোর কর্তব্যে কিন্তু ত্রুটি রাখিস না।"

এই শেষ কথাটার মানে আমি ভালই জানি। আমার স্ত্রী শ্বশুরবাড়ীর প্রায় কারোরই স্বীকৃতি পাবে না জেনেও বিয়ের অনুষ্ঠানে সব্বাইকে আসতে পীড়াপীড়ি করা। নাঃ, শেষ অবধি সেই অস্বস্তিকর কৃত্রিমতা থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। মানে নিজেরাই নিজেদের রেহাই দিয়েছিলাম আরকি। আমাদের বিয়েতে কোনোরকম অনুষ্ঠান করিনি। রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছিলাম শুধু। আমার তরফ থেকে হাজির ছিল শুধু বৌদি। মা আসবে শুনেছিলাম, কিন্তু আসেনি শেষ অবধি। শুধুই উপহার পাঠাল। আর প্রিয়ার তরফ থেকে তো কেউই না। ও বলল ওর আসার মতো কেউ নেই। তারিখটা কী ছিল? বলে দিতে হবে? অবশ্যই ১৪ই ফেব্রুয়ারী। সে-রাতে আমাদের ফ্ল্যাটের শোবার ঘরের সেই ফুলহীন বাসরে বন্ধ দরজার আড়ালে শুধু জেগেছিলাম আমি আর আমার রিমঝিম। দুজনের দুই শরীর যখন পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চিনছে, মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে, সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে ও আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে একজন সাধারণ মেয়ের মতোই আবিষ্ট গলায় বলে উঠেছিল, "বলো, নীল, বলো না – আজ তুমি আমার কাছে কী চাও – বলতে হবে তোমাকে – চুপ করে থেকো না প্লীজ।" আমার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল, "একটা মেয়ে চাই, ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে, যে ঠিক তোমার মতো হবে – ভেতরে ইনকমপারেবল, বাইরে অর্ডিনারী।"

বিধাতা বোধহয় শুনেছিলেন সেই ইচ্ছেটা। বছর-খানেক পরে আমাদের জীবনে এল প্রিয়ংবদা। হামাগুড়ি থেকে হাঁটতে শিখেই সে দুরন্তপনায় এমন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যে আমি ওর মাকে বলি ওকে হিমশিম বলে ডাকব। অবশ্য ওর দাদা-দিদিরা তাদের স্কুলের পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ওকে সামলাবার কাজটা অনেকটাই করে দেয়। দাদাদিদি কারা? কেন, সেই যে সাইকেলে করে রিমঝিমের পিছু নেওয়ার দিন ওর পুরনো আস্তানায় যাদের প্রথম দেখেছিলাম। ওদের মা (হ্যাঁ, রিমঝিমকে ওরা বরাবর ওই বলেই ডাকত) এখন অন্য একটা অনাথ আশ্রমে মাঝেমাঝে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যায় আর সরকারী স্বনির্ভরতা প্রকল্পের মহিলারা বাড়ীতেই ওর কাছে শিখতে আসেন হাতের কাজ। তবে ওর আজকাল সময়ের বড্ড অভাব। হবেই তো – চার ছেলেমেয়ে সামলানো কি চাট্টিখানি কথা? আমি আমার কলেজের হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে যতটা পারি সাহায্য করি, কিন্তু ওদের মা ছাড়া চলে না। মা বকাবকি করলে তখন অবশ্য আমার কাছে।

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, আমি কিন্তু আমার লেখালেখি আর ছবি আঁকা ছাড়িনি। না, আমার কোনো বই আজও বাজারে বিক্রী হয় না, ছবিও যা আঁকি বাড়ীতেই সাজানো থাকে। তাতে আমার কিচ্ছুটি আসে-যায় না।

জীবনে সব জিনিস কি বিক্রীর জন্য?

এলেম নতুন দেশে

মালবিকা চ্যাটার্জী

তিথি প্রতিদিনই তার কলেজ যাবার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করে। সেইখান থেকেই বাসটা ছাড়ে। রোজ সে সবার আগে পৌঁছে যায়। বাসে উঠে তিথির নিজস্ব আসন বেছে নেবার পর আরো খানিকটা সময় থাকে। ইতিমধ্যে অন্যান্য যাত্রীরাও এসে যায়, আর বাসটা প্রায় ভর্তি হয়ে যায়।

তিথি পড়ে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। সারাদিনের নানারকম ক্লাসের জন্য বাড়ি থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র তার ওই কাঁধ থেকে ঝোলানো শান্তিনিকেতনী ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরোয় সে। কত কিছুই না ধরে ওই ব্যাগটাতে – বই-খাতা, পেন, একটা শাল, একটা ফল, একটা জলের বোতল, সেলফোন, এমনকি তার ছোট্ট ব্যাগটা, যেটাতে ও টাকাকড়ি, ক্রেডিট কার্ড আর একটা লিপস্টিক রাখে, সেটাও ঢুকিয়ে নেয় ওই কাঁধের ব্যাগটায়। ওটার জীপারটা ওপর থেকে টেনে দিয়ে তিথি নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে বেড়ায়।

এখনও তিথির খুব বেশি কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি তাই ক্লাসের মাঝের অবসর সময়গুলো সে লাইব্রেরিতে বা বাইরে লনে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে লেখাপড়া করে আর গান শোনে। এদেশে যেমন চেনা অচেনা সকলেই চোখাচোখি হলে একটু হেসে 'হাই' বলে, তেমন তিথিকেও বলে। তিথি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে, কিন্তু ওর এই সুন্দর সংস্কৃতিটা খুব ভাল লাগে। দেশের সংস্কৃতি আবার একটু আলাদা ধরনের – অচেনা মানুষ প্রয়োজন না থাকলে কথা বলে না, আর চেনা মানুষ অনেক বেশি কথা বলে। তিথি এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজেকে একজন ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ হিসেবে তৈরী করে নিয়েছিল। কলকাতায় বড় হওয়া মেয়ে প্রতিদিনের যানজটের মোকাবিলা করতেই অভ্যস্ত ছিল। বাড়ি আর কলেজ করতেই সারাটা দিন কেটে যেত তার। বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে মা-বাবা আর ঠাকুমার সঙ্গে বসে জলখাবার খেতে খেতে তার নানারকম কথাবার্তা হতো।

ইতিমধ্যে একদিন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার কাছে চিঠি এল যে সে সেখানে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিক্স পড়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সে তখন কলকাতার কলেজে মাত্র ক'দিন ক্লাস করেছে। এই চিঠি পেয়ে তার এবং বাড়ির সবার আনন্দ ও সেই সঙ্গে একটা চাপা বেদনা জেগে উঠল। তিথির ঠাকুমা কেঁদে কূল পান না – "তুই ছাড়া যে বাড়িটা একদম খালি হয়ে যাবে দিদিভাই" – এছাড়া আর কোনও কথাই তাঁর মনে আসে না। মা ও বাবা বেদনাকে বুকের মধ্যে চেপেচুপে রাখেন। তাঁরা মেয়ের ভবিষ্যৎটা আর একটু বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে মনকে সংযত করেন।

এবার গোছগাছের পালা। বিদেশে যেতে গেলে কেমন ধরনের গোছগাছ করলে ঠিক হয় সেটা তাদের কারোরই জানা নেই। সবটাই নতুন আর আন্দাজে কাজকর্ম। অফিসে যাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিথির বাবা বুঝতে চেষ্টা করেন কেমন প্রস্তুতি দরকার। মা, বাবা ও ঠাকুমা তিনজনে তিন ধরনের ভাবনা চিন্তা নিয়ে নানাভাবে তিথির বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। স্যুটকেস তো মাত্র দুটো, আর একটা হাতে নেবার ব্যাগ – তাতে কী করে তিথির যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস আঁটবে তাই নিয়ে ঠাকুমা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। একটা ছোট প্রেসার কুকারে ভর্তি মশলাপাতি, তাছাড়া কড়াপাকের সন্দেশ, কুলের আচার, অন্যান্য জামাকাপড়ের সঙ্গে শীতের বেশ কিছু জামাকাপড়, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হলে তাদের উপহার দেবার জন্য কিছু ভারতীয় ঘর সাজাবার জিনিস ইত্যাদি নিয়ে রওনা হয়েছিল তিথি।

কলেজের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরাই তাকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল তিথির নতুন থাকার জায়গা, কলেজের ডর্মে। তাদের সাহায্যেই বাড়িতে খবর দেওয়া, নতুন সেলফোন কেনা, প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কেনার কাজ সারা হয়েছিল। খুব সুন্দরভাবে এরা একজোট হয়ে থাকে; নিজেদের এবং এদেশের আদব কায়দা অনায়াসে মানিয়ে নিয়ে চলে। এমনি করেই তিথি এই নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। শুধু অভ্যস্ত হতে পারল না শীতকালের নিউ ইয়র্কের সঙ্গে। এই ঠান্ডা আর বরফ তাকে বড্ড কাবু করে তোলে।

সেদিন বাস স্ট্যান্ডে আসতে তার একটু দেরিই হয়েছিল। সেইজন্য বাসে উঠে প্রতিদিন সে যে আসনটি বেছে

নেয় সে আসনটি আজ আর খালি পেল না। অগত্যা তাকে অন্য জায়গায় বসতে হয়। সে বেছে নেয় উল্টোদিকের সারিতে একটা সিট্। বাসে যাবার এই দিকটা ওর তেমন সড়গড় নয়, কারণ সে রোজই একই দিকে, একই সিটে বসে। সেই দিকের রাস্তাটা তিথির খুব ভাল করে চেনা। কোন দোকান কখন খোলে, রাস্তার কোন বাঁকটায় একদল ছেলে ওই সকালেই আড্ডা জমায়, ব্যস্ত-সমস্ত লোকজন সাইড ওয়াক ধরে হেঁটে যায়, নানারকম গাড়ি, বাস, ট্যাক্সি, Uber, Lyft – বিরাট ব্যাপার! আর তার সবটাই তিথির এখন খুব চেনা দৃশ্য। এই দৃশ্যপটে এত কিছু চলতে থাকে অথচ হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি বা অনর্থক আওয়াজের কোনও বালাই নেই। বড় ট্রাকগুলোর হাইড্রলিক ব্রেকের আওয়াজ আর শহরের hustle-bustle-এর একটানা চাপা আওয়াজ ছাড়া বিশেষ শব্দ কানে আসে না। মানুষজন এদেশে নিচু স্বরে কথা বলে। এই সবই তিথির চেনা হয়ে গেছে, তবু বারবার সে এগুলো দেখে, এই শৃঙ্খলা মনে মনে শেখার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ মানুষই এদেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখে; নিয়ম ও আইন মেনে চলাটাই এখানের রীতি।

যাইহোক, আজকের এই পরিবর্তনটা তিথির জীবনকে কেমন যেন একটা অদ্ভুত দিকে টেনে নিয়ে গেল, যেটা এই সিটে না বসলে হয়তো কোনদিনই ঘটত না। তিথি আপন মনে রাস্তার এই দিকটায় তাকিয়ে থাকে। এদিকের গলিগুলোর মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যায় উঁচুনিচু নানা মাপের বাড়ি। বেশিরভাগই একটু অপরিচ্ছন্ন গোছের। অন্য দিকটায় যেমন একটা ঝকঝকে ভাব আছে এদিকটা ঠিক তেমন নয়। ওদিকটায় সারবন্দী দোকানপাট আর কিছু উঁচু উঁচু অফিস বাড়ি। রাস্তার এপার ওপারের এমন পার্থক্য কেমন যেন নাড়া দিল তিথির ভাবনায়। বাসটা একটা ট্র্যাফিক আলোয় থামায় তিথি দেখল একটি ছোট্ট মেয়ে লাইটপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে চোখ কচলে কচলে কাঁদছে। বাস ছেড়ে দেবার পরেও ও মাথা ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখল যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর কী মনে করে পরের স্টপে বাস থেকে নেমে মেয়েটির দিকে হাঁটতে লাগল। দেখল মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে, কাঁদছে না আর, কিন্তু চোখদুটো তখনও ভেজা। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে খুব যত্ন করে মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁদছ কেন?' মেয়েটি যারপরনাই অবাক হয়ে তিথির মুখের দিকে কয়েক দন্ড তাকিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে চাইল; কিন্তু তিথি তার হাতটা ধরে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না।' মেয়েটি এবার আরো অবাক; তার ক্ষতি! তার চোখের জল দেখে তো কেউ কোনদিন আমল দেয়নি, আজ হঠাৎ এ কেমন ঘটনা! তিথি আবার সাবধানে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল সে কাঁদছে কেন। মেয়েটি হাতদুটো জড়ো করে আবার সেখান থেকে সরে যেতে চাইল। তিথিও ওর সঙ্গে চলতে চলতে মেয়েটিকে নিজের নাম বলল। বলল সে কাছেই একটা কলেজে লেখাপড়া করে। সে ইন্ডিয়া নামে একটি দেশ থেকে এই দেশে সবে এসেছে, এখনও এখানের কিচ্ছু জানে না; ছোট্ট মেয়েটি যদি ওকে সাহায্য করে তাহলে তিথির খুব ভাল লাগবে। ও এমনই একটি ছোট্ট বন্ধু খুঁজছিল। এবার মেয়েটির একটু মজা লাগলেও, সেই চাপা সন্দেহটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। ওর কাছে তো কেউ কখনও কোনো সাহায্য চায়নি! মেয়েটির সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথা বলে তিথি জানতে পেরেছিল তার নাম ডোরা। তাকে আদর করে বলেছিল, 'এই নামটা আমার খুব পছন্দ, কারণ আমার যখন তোমার মতো বয়স ছিল তখন "ডোরা দ্য এক্সপ্লোরার" শো শুরু হয় আমেরিকাতে। আমরা ইন্ডিয়ায় বসেও দেখতাম সেই শো। খুব ভাল লাগত। ডোরা কতকিছু শেখাত; তুমিও আমাকে শেখাবে এদেশের জিনিস?' আট বছর বয়সী ডোরা খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল। এইভাবেই তাদের বন্ধুত্ব শুরু হয়। সেদিনের মতো তিথি ডোরাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। নিজের ব্যাগ থেকে একটা আপেল বের করে ডোরার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হলে। আমি রোজ এই সময় কলেজে যাই, তুমি যদি এমন সময় এখানে দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে আর গল্প করে তারপর আমার কলেজে যাব।' ডোরা একরাশ সন্দেহ ও সম্ভাবনা নিয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

পরের দিন আবার সেই স্টপে নেমে পড়ে তিথি। ডোরাও তার কথা রেখেছিল, সে অপেক্ষা করছিল সেখানে তিথির জন্য। তিথিকে দেখে সে খুব খুশি হ'ল; ও যে ভাবতেও পারেনি তিথির মতো কেউ আবার ওর সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা রাখবে! ওরা সব বড় মানুষ – ডোরাদের মতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবন তো ওদের নয়, ওদের সময় কোথায় অত! তিথি আজ

একটু বেশি করে খাবার নিয়ে এসেছে ডোরাকে দেবে বলে – ফল, চকলেট, স্যান্ডুইচ, দুধ আর একটা ছোট্ট 'ডোরা পুতুল'| সাইড ওয়াকের একটা বেঞ্চে দুজনে গিয়ে বসে| তিথি ডোরার জন্য আনা জিনিসগুলো তার হাতে দিয়ে বলে, 'তুমি এখন এই স্যান্ডুইচ আর দুধটা খেয়ে নাও| অন্যগুলো পরে খেও| ডোরার তখন মোটেই খাবারে মন নেই, পুতুলটা হাতে পেয়ে মহা আনন্দে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে| 'থ্যাংক ইউ' বলতে ভুল হয় না তার|

এমনি করেই ডোরার সঙ্গে তিথির ভাব জমে উঠতে লাগল| এখন প্রতিদিন ওদের দেখা হয়| তিথি যখন ক্লাসের মাঝখানে কলেজের মাঠে গিয়ে বসে, ডোরা তখন আসে তিথির কাছে| তিথি ডোরাকে লেখাপড়া শেখায়| নিজের জীবনটাকে সুন্দরভাবে তৈরী করে তোলার স্বপ্ন দেখতে শেখায় ওকে| ডোরার প্রতিটি হোঁচট খাওয়া পথে তিথি স্নেহভরে তার দু'হাত বাড়িয়ে দেয়| ডোরাও তিথির কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ| ইতিমধ্যে এতদিনের পরিচয়ে ডোরার জীবনের গল্প তিথির জানা হয়ে গেছে|

ডোরা অনেক ছোট বয়সে মা বাবার সঙ্গে 'এল স্যালভাডোর' থেকে এসেছিল এই দেশে| তখন সে শিশু| ওদেশে ড্রাগ পাচার আর নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার তখন তুঙ্গে| ওরা ওই অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে আসে ওখান থেকে| এখানে এসেও যে ওরা খুব আরামে ছিল তা নয়; কিন্তু নিজের দেশে যে অবস্থায় ছিল তার থেকে অনেক ভাল ছিল আমেরিকায়| আমেরিকা স্বপ্ন পূরণের দেশ – সে কথা সকলেই জানে| তাই ওরাও চেয়েছিল নিপীড়িত অবস্থা থেকে পালিয়ে এই দেশে এসে স্বপ্ন পূরণ করতে| কিন্তু একটা সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে তো একটু সময় লাগবেই! কাজ ও অন্নের সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষে ওরা নিউ ইয়র্কে আসে| ডোরার বাবার অল্প-চেনা এক বন্ধু একটা ছোট কম্পানিতে কাঠের কাজ করে| কোনভাবে ডোরার বাবার সেখানে একটা কাজ জুটে যায়| তারপর মোটামুটি সব ভালই চলছিল| একটা নিশ্চিত অর্থ সমাগম হচ্ছিল| ডোরাও ক্রমশ বড় হচ্ছে| তার পাঁচ বছর বয়স হতে স্কুলে দেওয়া হ'ল| কিন্তু হঠাৎ ডোরার বাবার কী হ'ল কিছুই বোঝা গেল না| একদিন কাজের পর সে আর বাড়ি ফিরল না| ডোরার মা ও তার বন্ধুরা চারদিকে খোঁজখবর করেও কোন হদিশ পেল না| কেঁদে কেঁদে ডোরার চোখের জলও শুকিয়ে গেল| ওরা ধরে নিল ওদের জীবন বাবা ছাড়াই কাটবে| যে ছোট্ট 'লো ইনকাম লিভিং' বাড়িটায় ওরা থাকত, নিয়মিত অর্থ উপার্জনের অভাবে সে বাড়ি ছেড়ে দিতে হ'ল| কোথায় পাবে বাড়ি ভাড়ার অর্থ! ওরা গিয়ে উঠল সরকারী আবাসে| সেখানে অনেকে একই জায়গায় থাকে; শোয়া, বসা, বাথরুম সবই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে চলতে হয়| জীবনের এই ধকলে মাঝ থেকে ডোরার স্কুলে যাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়| তার মা যখন যেমন কাজ পায় তেমনভাবে চালায়| কোনও স্থিরতা নেই সেসব কাজের| তিথির সঙ্গে ডোরার প্রথম পরিচয়ের দিন লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল ডোরা, সেদিন তার কান্নার কারণ ছিল দুদিন ঠিকমতো খেতে না পাওয়ার ক্ষিধে| তার মা দরজায় দরজায় ঘুরে চেষ্টা করছিল কিছু কাজ জোগাড় করার কিন্তু সফল হয়নি; আর এমন অবস্থায় মার কাছে নিজের ক্ষিধের কথা জানিয়ে বকুনি খেয়েছিল বলে কাঁদছিল ডোরা|

তিথির কেমন যেন একটা মায়া জন্মে যায় ডোরার প্রতি| এমন সুন্দর ঝলমলে একটি মেয়ে কেন এত কষ্ট আর অনিশ্চয়তায় জীবন কাটাবে| ভারতে ছোট বাচ্চাদের ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথে পথে ঘুরতে দেখেছে, মন উতলা হলেও তাদের হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি তিথি| কিন্তু আমেরিকায় এসেও যে এমন একটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, সেটা কখনও ভাবতেও পারেনি সে| আমেরিকা মানে প্রাচুর্যের দেশ, আরামের দেশ – এমনটাই অন্য দেশের মানুষরা মনে করে| কিন্তু এখানেও যে অনেক মানুষ গৃহহীন, দৈনিক খাবারের সন্ধান করেও অনেক ক্ষেত্রে সফল হয় না, সে হিসেবটা আমেরিকায় না আসা অবধি জানা যায় না| এখানের সরকার অনেকটা দায়ভার নেয় ঠিকই, কিন্তু তাতে সবটা কুলোয় না| তিথি কত বাচ্চার পাশে দাঁড়াবে? এখানে গরিব বাচ্চারা স্কুলে গেলে অন্তত একবেলার খাবার পায়, কিন্তু নানা কারণে সব গরিব বাচ্চার স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠে না| সংসারের চাপে, পেটের দায়ে ছোট-বড় সকলকেই যেমন হোক কাজ করতেই হয়|

আমেরিকার আশপাশের গরিব দেশগুলো থেকে যেসব নিঃস্ব মানুষরা নিজেদের সর্বস্ব পিছনে ফেলে আমেরিকায়

স্বপ্ন দেখতে আসে – সেইসব পুরুষরা অনেকেই বাড়ি বাড়ি লন কাটার, গাছপালা ও বাগান দেখভাল করার কাজ করে। মহিলারা মানুষজনের বাড়িঘর পরিষ্কার করে, সুবিধামতো কখনও স্কুলে পরিষ্কার করা বা ক্যান্টিনে খাবার গুছিয়ে পরিবেশন করা ও বাসন ধোয়ার কাজ পেয়ে যায়। অনেকে সপরিবারে আসতে পারে না, তাদের আধখানা সংসার পড়ে থাকে ফেলে আসা জন্মভূমিতে। ভিসার ব্যাপার আছে, অনেকেই আইনগতভাবে থাকতে পারে না; এভাবে বেশ কিছু মানুষের সারাটা জীবন কেটে যায়। ভাগ্য প্রসন্ন হলে এবং ভিসার ঝামেলা না থাকলে অনেকে কম্পানিতে বা ফ্যাক্টরিতে কিছু কাজ পেয়ে যায় । এরকম অনেকে প্যাকেজিং কম্পানিতেও কাজ করে। তাদের জীবন খানিকটা স্বচ্ছল হয়ে ওঠে এমন একটা নিশ্চয়তার জন্য। কম্পানিতে কাজ করলে সেখানে কিছু কিছু সুবিধাও পাওয়া যায়।

ডোরারা আইনগতভাবেই রয়ে গেছে, কিন্তু তাতে তাদের দুর্দশার উপশম হ'ল কোথায়! তার বাবা থেকেও নেই, কোথায় হারিয়ে গেল আচমকা, আর হদিশ মিলল না। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানে না ওরা। ওদের জন্য তিথির একটা চিন্তা লেগেই থাকে। মা ও মেয়েকে একটা সুন্দর জীবন দিতে মন চায় ওর, কিন্তু কী করবে! ওর ক্ষমতা কতটুকু!

এর মধ্যে একদিন তিথির প্রফেসর বলছিলেন তাঁদের বাড়ি পরিষ্কার করার মহিলা অন্য চাকরি পেয়ে যাওয়ায় কাজ ছেড়ে দেবে জানিয়েছে। খুব অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন তাঁরা, একজন বিশ্বস্ত মহিলার খোঁজে আছেন; যদি কারো জানাশোনা কেউ থাকে তো জানাতে। তিথি লুফে নিয়েছিল কথাটা। সেইদিনই কলেজের পর ডোরাদের বাড়ি গিয়ে তার মাকে এই সম্ভাবনার কথা জানায়। ডোরার মা আপত্তি করেনি। যে কোনও রোজগারের সুযোগ কী হাতছাড়া করা যায় তাদের মতো অভাবের সংসারে! তিথি পরের দিন তার প্রফেসরকে ডোরার মা'র কথা বলে এবং তারপর একে একে খুলে যেতে থাকে ডোরাদের সুদিনের দরজা। সেই বাড়ির কাজ থেকে শুরু করে ডোরার মা আরো বেশ ক'টা বাড়িতে কাজ পেয়ে যায়। সপ্তাহের সাতদিনই কাজের মধ্যে কেটে যায় তার। এখন আর তাদের অভাবের সংসার নয়। তারা একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছে। ডোরা স্কুলে যায়; তিথির কাছে লেখাপড়ার সাহায্য পায়। স্কুলে সে ভাল রেজাল্ট করে। তিথির মতো তারও অংকে ঝোঁক। ডোরাও তিথির মতো হতে চায়। তিথি যে ডোরার আদর্শ!

ছ'বছর পর তিথির ব্যাচেলর্স আর মাস্টার্স দুটো পড়া শেষ হয়। সে ম্যানহ্যাটেনে একটা কাজ পেয়ে যায়। তারপর সন্ধান করে আবার তিথি লেখাপড়ার জগতে ঢোকে পিএইচডি করতে। তিথির পিএইচডি করাকালীন ডোরার স্কুল শেষ হয়। সে নিউ ইয়র্ক স্টেট কলেজে ভর্তি হয় তার ব্যাচেলর্স ডিগ্রী করতে।

তিথি আর ডোরা, দুজনের বয়সের পার্থক্য অনেকটা, কিন্তু দুজনে দুজনার পরম বন্ধু এবং অত্যন্ত আপনজন। তিথির সহযোগিতায় এবং নির্দেশে ডোরার জীবন যে দিশা খুঁজে পেয়েছে, সে কথা ডোরা বা তার মা কখনও এক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকেনি। তিথির প্রতি তাদের উপচে পড়া কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা তিথিকেও নতুন দেশে ক্রমাগত মন বসাতে সাহায্য করেছে।

তিথির রক্তের সম্পর্ক তার মা-বাবা, ঠাকুমার সঙ্গে যোগ হয়েছে তার প্রাণের সম্পর্ক ডোরা ও ডোরার মা। এই সকলে মিলে তিথির জীবন নানাভাবে ভরিয়ে রেখেছে।

কোথায় ভারত আর কোথায় এল স্যালভাডোর! দু'দেশের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা; কিন্তু ডোরা আর তিথির মিলন হয়েছিল মানব সংস্কৃতির ভিত্তিতে। সেই সংস্কৃতি সারা দুনিয়ায় সকলের এক।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

অন্য আকাশ

সেতারা হাসান

আর ২০-২৫ বছর পরে জন্মালে মেয়েটির ভাগ্য হয়তো অন্যরকম হতো। পৃথিবীর আর সব লক্ষ কোটি শিশুর মতো মেয়েটিও নিজের জন্মের সময় নির্ধারণ করেনি। মা-বাবা বেছে নেওয়ার ব্যাপারেও তার কোনো হাত ছিল না। অন্য সব শিশুর মতোই ও যে নিজেই পৃথিবীতে আসার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল তারও কোন প্রমাণ নেই। তার জন্ম লক্ষ কোটি মানব সন্তানের মতো প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়েছে। অথচ জন্ম মুহূর্ত থেকে তার নিজের ভাগ্য যেমন দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার পরিবারকেও সেই দুর্ভাগ্যের ভার বহন করতে হয়েছে।

পরিবারের কর্ত্রী মেয়েটির পিতামহী, দাদী জেবুন্নেছা বেগম। আঞ্চলিক প্রথায় নামটা হয়ে দাঁড়ায় "জইবুন"। তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ নাম ধরে ডাকার দরকার পড়ে না। ডাকেও না কেউ, ওঁর পরিচিতি হালিমার মা হিসেবেই। এই পরিবারে জেবুন্নেছার প্রভাব বিশাল। শুধু বয়স এবং সম্পর্কের জেরেই নয়, জীবনযুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের জন্যেও বটে। জীবনের অনেকগুলো বছর প্রায় একাই যুঝে গেছেন। জেবুন্নেছা মাত্র ১৯ বছর বয়সে দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে আশানুরূপ সাহায্য পাননি। ওঁদের সহানুভূতি শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ঐ পরিবারেরই আর এক সদস্যকে বিয়ে করার প্রস্তাবে। অতুলনীয় রূপের অধিকারিণী জেবুন্নেছার কাছে সেই সহজ সমাধানের প্রস্তাব বহুবারই এসেছে; আর জেবুন্নেছা প্রত্যেকবারই সেসব সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সব রকমের লোভের হাতছানি উপেক্ষা করেছেন তিনি।

বুদ্ধিমতী জেবুন্নেছা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনরকম বাকবিতন্ডায় না জড়িয়ে, বিরোধ-বিদ্বেষ না বাড়িয়ে এক সময় বাপের বাড়ির গ্রামে চলে এসেছিলেন। সেখানে কয়েক গ্রামের মাথা, প্রবল প্রতাপশালী 'দেওনিয়া' হাজী নাসিরুদ্দিন সর্দারের কাছাকাছি চলে আসেন তাঁর ছত্রছায়ায় থাকার জন্য। তাঁর নিজের ভাইরা গরীব এবং নিরীহ; জানতেন তারা কিছু করতে পারবে না। তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়। স্বামীর সম্পত্তির ভাগ, কয়েক বিঘা জমি নিয়ে তিনি শুরু করেন তাঁর জীবন সংগ্রাম। শক্ত হাতে, কঠোর পরিশ্রম করে তিনি ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছেন, অসচ্ছলতার মধ্যে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে।

কিন্তু এই কাহিনী জেবুন্নেছার নয়; আবার বলা যায় জেবুন্নেছারও। বুদ্ধিমতী জেবুন্নেছা তাঁর রূপসী মেয়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিজেই উদ্যোগী হয়ে দেওনিয়ার ছেলের সঙ্গে হালিমার বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। সামাজিক বৈষম্য জানা সত্ত্বেও তিনি সাহস করেছিলেন উঁচুতে হাত বাড়াতে। হালিমার রূপ ছিল – তিনি যুগিয়েছিলেন শিক্ষা আর সহবৎ। বিনয়, ভদ্রতা, শালীনতা, তার সাথে ঘর-গৃহস্থালি চালাবার বাস্তব শিক্ষা যত্ন করেই শিখিয়েছিলেন। কাজেই হালিমাকে নুরুদ্দিন সর্দারের সঙ্গে বিয়ে দিতে হাজি নাসিরুদ্দিন সর্দারের পরিবারের আপত্তি হয়নি।

ছেলে হাশেম, মানে হাসুকেও যত্ন করে মানুষ করেছেন। জাগ্রত প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর কেটেছে সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা এবং প্রাসঙ্গিক কাজ করে। অনেক টানাটানি সত্ত্বেও ছেলেকে পড়িয়েছেন। পড়াশুনার ব্যাপারে মেধা বা আগ্রহ ছিল না হাশেমের। কোনরকমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দেয় হাশেম। পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ নয়। উচ্চ শিক্ষার পরিবর্তে অন্যভাবে জীবিকার সন্ধান করার পরামর্শ দেয় বেয়াই নাসিরুদ্দিন, জামাই নুরুদ্দিন। হাশেম মাতৃভক্ত, মাটি ভক্ত। সে কখনই গ্রাম ছেড়ে, মা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায়নি। পরিশ্রমী, সৎ এবং বিনয়ী হাশেমকে জেবুন্নেছা চাচাদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহ দেন। চাচারাও অগ্রাহ্য করতে পারেন না বিনয়ী, সুদর্শন একই রক্তের ভাতিজাকে। একসময় তাদের পাওনা বাগানের ভাগ, পুকুরের ভাগ ইত্যাদি পায় হাশেম। চাষবাসের দিকে মনোযোগ দেয় সে। পুকুরে মাছ চাষ করে। বাগানে ফলের গাছেও উন্নতি করে। কিছুদিনের মধ্যেই সে উঁচু দাওয়ার বড় মাটির ঘর, বড় উঠোন, ঢেঁকি-ঘরসহ ছোট রান্নাঘর ইত্যাদি বানাতে সমর্থ হয়। সংসারে প্রাচুর্য আসে না, স্বাচ্ছন্দ্য আসে সামান্য; খাওয়া-পরা চলে যায়। কাজেই জেবুন্নেছা নিজে পছন্দ করে, শুভদিন দেখে এক লাবণ্যময়ী কিশোরীকে হাশেমের বউ

করে ঘরে আনেন। নাম রোকেয়া। যথা সময়ে ১৬ বছরের রোকেয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়। সতত সাবধানী জেবুন্নেছা তাঁর সাধ্যমতো রোকেয়ার যত্নআত্তি করেন। প্রসবের জন্য জেবুন্নেছা প্রসূতিকে নিজের কাছেই রাখার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত বউটি বাড়িতে না থাকলে বড্ড খালি খালি লাগে। দ্বিতীয়ত রোকেয়ার বাপের বাড়িতে অনেক লোক – ভাই, ভাতিজা, ভাতিজীদের নিয়ে ওর ভাবীরা এমনিতেই ব্যতিব্যস্ত। সদ্য প্রসূতি রোকেয়া এবং সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতককে বাপের বাড়ির লোকের চাইতে তিনিই প্রয়োজনীয় সেবা দিতে পারবেন। সে জন্যই রোকেয়াকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়িতে যাবার অনুমতি দেন। তারপর নিজের কাছেই রাখেন। বাপের বাড়ি থেকেও কোন আপত্তি ওঠে না। জেবুন্নেছা গত ক'মাস ধরেই বাচ্চার কাঁথা সেলাই করছেন। এমনিতেও জেবুন্নেছা রাত জেগে নিজেদের জন্য আর বিক্রির জন্য রঙিন শিকা বানাতেন, হাতপাখায় ঝালর লাগাতেন, বড়দের কাঁথা সেলাই করতেন। একা হাতে যখন বাচ্চাদের বড় করছিলেন তখন এভাবেই নগদ টাকার প্রয়োজন মেটাতেন তিনি।

একমাত্র পুত্রসন্তানের বউ ঘরে আসার পর তাঁর অবসর বেড়েছে। জমিজমার সাথে হাশেম কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে হালিমার স্বামীর পরামর্শে। শহর থেকে পাইকারি হারে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি এনে গ্রামে বিক্রি করে; সাথে তেল, সাবান, চিরুনি ইত্যাদি শখের জিনিসও রাখে। লাভ সাংঘাতিক কিছু নয়, তবু সংসারে কিছু অর্থ যোগ হয়। শহরে যাবার সময় পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে বিক্রি করতে। নিঃসন্দেহে সংসারে হাশেম অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। রোকেয়া তাই সৌভাগ্য – 'রহমত' সঙ্গে আনার বাহক বলেই চিহ্নিত। তাছাড়া ঘরের কাজেও রোকেয়া জেবুন্নেছার দোসর। দুজন মিলে হাঁস-মুরগির সংখ্যাও বাড়িয়েছেন। বলা বাহুল্য এখন জেবুন্নেছার হাতে বাড়তি সময় থাকায় তাঁর সৌখিন কাজ বেড়েছে। তিনি হাশেমকে দিয়ে সুন্দর একটা পিতলের কাজলদানি আনিয়ে নিয়েছেন – লম্বা পাতার মতো; খোলা যায়, বন্ধ করা যায়। তারপর তিনি কুপি জালিয়ে, কুপির শিখার উপর কাজললতা ধরে রেখে পরম ধৈর্য সহকারে কাজল বানাচ্ছেন। বাচ্চা প্রসবের সময় কাছে চলে আসায় তিনি পিঠা-পুলির জন্য চালের গুঁড়ো, গুড় ইত্যাদি তৈরি করে রাখেন। সন্তান হলে, তা সে নাতি বা নাতনি যাই হোক না কেন, লোকজনকে খাওয়াতে হবে; অন্তত আপন লোকদের, কাছের আত্মীয়দের, সুখে-দুঃখে পাশে থাকা প্রতিবেশীদের।

প্রসবে সিদ্ধহস্ত গ্রামের দাইমা আই কয়েকবার দেখে গেছেন রোকেয়াকে। জেবুন্নেছা দাই-এর জন্য একটা নতুন শাড়ি আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। মাঝরাতে রোকেয়ার ব্যথা উঠলে হাশেম আনতে যায় দাইকে। পাশের বাড়ি থেকে হালিমার শাশুড়ি চলে আসেন। দাইও এসে পড়ে সময়মতো। কয়েক ঘন্টা ব্যথা আর উদ্বেগের পর ভোরবেলা, সুবেহ সাদেকের সময় যখন আকাশে শেষ তারাটি যাব যাব করছে, পুবের আকাশে আবছায়া আলো, ঠিক তখন একটি নবাগত শিশুর কান্না শোনা গেল। প্রসূতির ঘর থেকে কোন আনন্দধ্বনি শোনা গেল না। এতক্ষণ ধরে দোয়া-দরুদ-পড়া স্বরগুলো "আলহামদোল্লিল্লাহ" বলে উঠল না। প্রথমে দাইমা নব জাতককে দেখে আঁতকে উঠে কাপড় জড়িয়ে দেয়। অধীর জেবুন্নেছা দোয়া পড়তে পড়তে হাত বাড়িয়ে শিশুকে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যান। বেয়ানের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হালিমার শাশুড়ি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে "হায় আল্লাহ, তুমি রহম করো" বলে মুখে কাপড় দেন, পাছে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। এতক্ষণ সবার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা রোকেয়া এবার সন্ত্রস্ত হয়। অর্ধেক রাত ব্যথা আর প্রসবের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সবে হাঁপ ছেড়ে সুস্থির হয়েছিল, কিন্তু জেবুন্নেছার মুখে হাসি না দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। জেবুন্নেছা আস্তে করে নব জাতককে রোকেয়ার বাড়ানো হাতে দিলে রোকেয়া এক নজর দেখেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। শিশুটি মেয়ে, ফরসা ফুটফুটে। চার হাত-পা, পাঁচটা করে আঙুল সবই ঠিক আছে। কিন্তু সুন্দর দুটি চোখের নিচে, নাকের কাছাকাছি এসে মুখটা একেবারে বিকৃত। নাকের বামপাশটা খোলা, যার ফলে জিভ এবং মুখের ভেতর বেশ কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। উপর ঠোঁটের দুদিকই চেরা, শুধু মাঝখানে সামান্য একটু অংশ নাকের সাথে লেগে আছে। রোকেয়া নির্নিমেষে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুচোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়িয়ে পড়ে। অন্য ঘরে হাশেম যে অধীর আগ্রহে শুভ সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা আর কারো মনে থাকে না। প্রাথমিক শোকের ধাক্কাটা সামলে ওঠার আগেই খাওয়া নিয়ে

মেয়েটির সমস্যা দেখা দেয়। ঠোঁট, মাড়ি এবং জিভের সামঞ্জস্য না থাকায় শিশুটি ঠিকমতো মা'র বুকের দুধ পান করতে পারে না। বদনার মুখে কঞ্চির টুকরো লাগিয়ে তার উপর কাপড় জড়িয়ে দিলেও মেয়ের পক্ষে দুধ টানা সহজ হয় না। শেষে চামচ দিয়ে একটু একটু করে দুধ খাওয়ানো হয়। না, মেয়েটির বিকৃত মুখ দেখার পর আর আত্মীয়-পাড়াপড়শিদের পিঠা খাওয়ানো হয় না। উৎসব আনন্দের ইচ্ছা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। প্রথমদিকে সবাই ধরে নিয়েছিল মেয়েটি বেশিদিন বাঁচবে না হয়তো। না বাঁচলে কেউ যে খুব মর্মাহত হতো এমনও নয়। বরং মারা গেলেই মেয়েটি সবদিক দিয়ে মুক্তি পাবে – মোটামুটি এই ভাবনাটাই সবার মনে ছিল। এমনকি মা হয়ে রোকেয়াও মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ সমাধান বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি অদ্ভুতভাবে বেঁচে যায়; এবং বেঁচে থাকে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েই। অতএব সবাই অসহায়ভাবে ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বাড়িভর্তি মানুষের হতাশার মধ্যেই খোঁজ নেওয়া হয় মেয়েটির কোন চিকিৎসা করা যায় কিনা। হাশেমের সীমিত সামর্থ্য, আরো সীমিত তার জ্ঞান। শহর সম্বন্ধে আর চিকিৎসার ব্যাপারে সে একেবারেই অজ্ঞ। এক্ষেত্রে জেবুন্নেছাও অসহায়। বিব্রত হাশেম কী করবে ভেবে পায় না। হালিমা আর তার স্বামী খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করে। ভাই-এর এই মেয়েটির জন্য হালিমা দারুণ মর্মাহত! সে-ই উদ্যোগী হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে রোকেয়াসহ সদরে যায় ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার গম্ভীরমুখে জানান এরকম অবস্থার একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার; বিশেষ ধরনের সার্জারি। সেটা এখানে সম্ভব নয়, ঢাকায় নিয়ে গেলে দেখা যেতে পারে। ঢাকার কথা শুনে হাশেম ভয় পেয়ে যায়। তার অর্থবল সীমিত। আদতেই যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া যাবে এবং পাওয়া গেলেও যে চিকিৎসা সফল হবে তেমন নিশ্চিত আশ্বাসও কেউ দিতে পারে না। হালিমা আর তার স্বামী সাহায্য করতে চাইলেও আরো অনেক সমস্যার সমাধান সহজ মনে হয় না। চিকিৎসার খরচ ছাড়াও থাকা-খাওয়ার জায়গা এবং খরচ, যাতায়াত, কতদিন থাকতে হবে, ডাক্তারের সঙ্গে কে কথাবার্তা চালাবে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে রোকেয়ার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মলগ্ন এসে যায়। স্বভাবতই পোড়াকপালীর চিকিৎসার আগ্রহতে ভাঁটা পড়ে।

শেষপর্যন্ত নামাজের পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমেই সবাই সান্ত্বনা খোঁজে।

প্রথম মেয়ের দেড় বছরের মাথায় একেবারে ঘর আলো করে রোকেয়ার আরেকটি মেয়ের জন্ম হয়। নিখুঁত! রঙে-রূপে অনবদ্য! এবারে সবার আনন্দ উছলিয়ে উঠে। আজান হয়। পিঠা, মিষ্টি বিলানো হয়। উৎসব করে আকিকা হয়, নাম রাখা হয়। আর সেই সঙ্গে প্রথম মেয়ে আরও আড়ালে পড়ে যায়। তার তেমন আদর না জুটলেও খাবারটুকু আর পরার কাপড় জোটে। আশ্চর্যজনকভাবে মেয়েটি অতি অল্প বয়সেই তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে নিজের প্রয়োজন মেটাতে সিদ্ধ হয় – দাবী করে, প্রতিবাদ জানায়। আর এসবের জন্য যতখানি শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার দরকার হয় তার সবটুকুই সে প্রয়োগ করে। সময়ের আগেই সে বসা থেকে হামাগুড়ি দেওয়া, হামাগুড়ি থেকে উঠে দাঁড়ানো, হাঁটি হাঁটি পা-পা থেকে সরাসরি দৌড়ানো সহজেই আয়ত্ত করে ফেলে।

ওর বোন হালিদার জন্ম হলে মেয়েটি তার আদরে ভাগ বসাতে ব্যস্ত হয়। ঠেলে সরিয়ে দিলে হাঁউমাঁউ করে উঠে। আর তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে কথা বলা মেয়েটির পক্ষে অসম্ভব। কথা বলার চেষ্টা করলে কতকগুলো দুর্বোধ্য শব্দ বের হয়ে আসে গলা থেকে। আসলে জিভ, তালু আর ঠোঁটের সাহায্যে যে শব্দগুলো কথার রূপ পায়, তার কোনটাই মেয়েটির আয়ত্তে নেই। তবু মেয়েটি প্রাণপণে কথা বলে যায়। গলার রগ ফুলে ওঠে, মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির শব্দ বের হয়। মেয়েটি সবার কথা বুঝতে পারে কিন্তু তার কথা সে কাউকে বোঝাতে পারে না। মাঝ থেকে তার নাম হয়ে যায় 'গুঙ্গি'।

গুঙ্গি কিন্তু হার মানে না। হালিদার পর একটি ভাই হলে প্রতিযোগিতা আরো বেড়ে যায়। গুঙ্গি তীক্ষ্ণ নজর রাখে ভাই, বোনসহ বাকি সবাই কী খাচ্ছে, জামা-কাপড় কার কেমন। দরকার হলে অনায়াসে অন্যের খাবার কেড়ে নেয়। জামা-কাপড় নিয়ে টানাটানি করে। চার বছরের গুঙ্গিকে বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। হালিমার ভাশুরের ছেলে, ইকবাল এমনই এক ক্ষিপ্ত অবস্থায় গুঙ্গিকে দেখে বিচলিত হয়। ছেলেটি বেড়াতে এসেছিল সে বাড়িতে। ইকবাল সদ্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে বলল এ ধরনের 'ক্লেফট প্যালেট'-

এর চিকিৎসা করতে পারলে মেয়েটি কথা বলতে পারত আর ব্যবহারও স্বাভাবিক হতো। সে নিজের আগ্রহেই জানায় যে খোঁজ নিয়ে জানাবে কিছু করা সম্ভব কিনা।

এর পর রোকেয়ার আরেকটি সুস্থ, সুন্দর ছেলের জন্ম হলে বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। যে কাজলদানি থেকে বিকৃত মুখের মেয়েটির চোখে কোনদিন কাজল লাগানো হয়নি, যদিও চোখদুটি তার সুন্দরই ছিল; সেই কাজললতা এখন নিয়মিত ব্যবহার হয়। জেবুন্নেছা মনের আনন্দে কাঁথা সেলাই করেন, পিঠা বানান, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শির সাথে উৎসবে মাতেন, আনন্দ ভাগ করে নেন সবার সাথে। আর সবাইকে অবাক করে ৭ বছরের গুঙ্গি ছোট ভাইটিকে বুক দিয়ে আগলিয়ে রাখে। বয়সের তুলনায় সে অনেক ভারি কাজই করতে পারত। এই ভাইটির দেখাশোনার সমস্ত কাজ গুঙ্গি প্রায় একাই সামাল দেয়। যদিও আর দুই ভাইবোনকে গুঙ্গি এখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করে; তবু ছোট ভাইটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার জিদ, দাপাদাপি অনেক কমে যায়। গুঙ্গি শান্ত হয়ে আসে।
অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো গুঙ্গি প্রাথমিক স্কুলে কয়েকদিন জিদ করে গেলেও, অল্প দিনের মধ্যেই যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই অমোঘ পরিণতি জানা ছিল রোকেয়ার। রোকেয়া গুঙ্গিকে ঘরের কাজ শেখাতে চেষ্টা করে। গুঙ্গি ছোটভাইকে ভীষণভাবে আদর করে, তার সব দরকার উৎসাহের সঙ্গেই মেটায়।

রাজশাহী থেকে খবর আসে যে এখনও ওখানে চিকিৎসা সম্ভব হবে না। ওই চিকিৎসার সেরকম ব্যবস্থাই নেই সেখানে। ঢাকা থেকেও চিকিৎসার সুরাহা হয় না। অর্থ, সময় এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব। গুঙ্গির বয়স পেরিয়ে গেছে। এসব অপারেশন ছোটবেলাতেই করতে হয় একাধিকবার, একাধিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে – যেমন ডেন্টাল সার্জন, প্লাস্টিক সার্জন প্রভৃতি। এসব চিকিৎসা এই পরিবারের জন্য আকাশ-কুসুম; ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

দিন বয়ে যায়। ছোট ভাইটি বড় হতে থাকে। আর আস্তে আস্তে গুঙ্গির প্রয়োজন তার কাছে কমে আসতে থাকে। গুঙ্গির তখন অন্যভাবে ব্যস্ত হবার দরকার হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, সবার বড় হবার দরুন এবং অন্যরা স্কুলে যাবার দরুন ঘর গৃহস্থালির একটা বড় অংশ গুঙ্গির ভাগেই পড়ে। গৃহকর্মে গুঙ্গি পারদর্শী হলেও কেউ জানে না কখন সে বেঁকে বসবে। বিশেষ করে হালিদা যা যা করে গুঙ্গিও সেগুলো করার চেষ্টা করে। হালিদা বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দিলে সেও সেখানে হাজির হয়, তা সে পুকুর পাড়েই হোক বা তাল কুড়োবার মাঠেই হোক। বউ-ঝিদের যে কোন অনুষ্ঠানে সে সবার আগে হাজির হয়, সেখানে তাকে ডাকা হোক বা না হোক। গুঙ্গি সত্বর বুঝে ফেলে যে কাজে হাত লাগালে তাকে কেউ খেদিয়ে দেবে না। কাজেই পাড়া সংক্রান্ত উৎসবে পিঠা বানানোই হোক অথবা বিয়েতে হলুদ বাটা, মেহেন্দি বাটাই হোক, গুঙ্গি আগ বাড়িয়ে সোৎসাহে যোগ দেয়।

এদিকে গুঙ্গির ১৩-১৪ বছরের বাড়ন্ত গড়নের শরীর ভরাট হয়। তার মুখের দিকে তাকাবার স্পৃহা না থাকলেও, শাড়ি-ব্লাউজের আড়ালে তার নিটোল দেহে পুরুষের নজর পড়ে বার বার। গুঙ্গি নিজের শরীরের দিকে তাকায়, আর তাকায় হালিদার প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের দিকে। তার নিজের শরীরে তখন এক সাগর ভরা আলোড়ন। পাড়ায় বিয়ে হলে সে বর-বউয়ের দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়। যথা সময় হালিদার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়। পাত্রপক্ষ দেখতে আসে। হালিদা নতুন শাড়ি পরে, ঘোমটা মাথায় লাজুক মুখে বসে থাকে। গুঙ্গি উতলা হয়ে ওঠে। বার বার মেয়ে দেখার আসরে যেতে চায়। পাত্রপক্ষ যদিও জানে গুঙ্গির কথা, তবু জেবুন্নেছা মনে করেন শুভ কাজে গুঙ্গি যেন বিঘ্ন হয়ে না দাঁড়ায়। তাই গুঙ্গিকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করেন। গুঙ্গিকে শান্ত করতে জেবুন্নেছা ওকে একটা নতুন শাড়ি দেন। বিয়ে উপলক্ষ্যে দিতেই হতো। সে যাহোক, ওকে নাহয় পরে আরেকটা কিনে দেবেন।
নতুন শাড়ি পরে গুঙ্গি বেরিয়ে যায় তার প্রিয় জায়গায় – বড় রাস্তার কাছে; যেখানে দূর দূর থেকে বাস আসে। দু'তিনটি নতুন দোকান হয়েছে। বাইরের লোকজন আসা যাওয়া করে। এই জায়গা বৌ-মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। একা যাবার তো প্রশ্নই উঠে না। গুঙ্গি অবশ্য কিছুদিন ধরেই এখানে লুকিয়ে আসছে, সেই দোকানগুলো গড়ে ওঠার পর থেকেই। সবাই যখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকে, অথবা ভর-দুপুরে ঘুমিয়ে থাকে, গুঙ্গি এখানে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখতে থাকে – বাসের আসা-যাওয়া, মানুষের ওঠা-নামা, দোকানের কেনাকাটা ইত্যাদি।

হালিদার বিয়ে নিয়ে বাড়িতে যত ব্যস্ততা বাড়ে, গুঙ্গির অস্থিরতাও তত বাড়তে থাকে। তার বিয়ের কথা হয় না। তাকে

কেউ দেখতে আসে না। আসন্ন বিয়ে উপলক্ষ্যে হালিদাকে ঘিরে নানা রকম অনুষ্ঠান হয়। ঘরোয়া ছোট অনুষ্ঠান; শুধু পাড়া-প্রতিবেশী মেয়ে আর অল্পবয়সী মহিলাদের নিয়ে। একদিন হালিদার গায়ে হলুদ লাগানো হয়। তাকে ঘিরে বসে সবাই গান করে। আরেক দিন তার মাথায় তেল, সর্ষেবাটা লাগানো হয়। তারপর তাকে মাঝখানে রেখে মেয়েরা চারদিকে গোল করে ঘিরে দাঁড়ায়; সেভাবেই তাকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে গোসল করানো হয়। আরেক দিন হালিদাকে মাঝখানে বসিয়ে নানারকম খাবার খাওয়ানো হয়। গুঙ্গি দিনের পর দিন রুদ্ধশ্বাসে এসব দেখে। ওর অস্থিরতা চরমে পৌঁছায়। গুঙ্গি আরও ঘন ঘন বড় রাস্তায় যায়। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখতে থাকে। একদিন শমসের নামের লোকটি তাকে ঝোপের আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়, যে মাঝে মাঝে ওই দোকানগুলোতে ফাই-ফরমাস খাটে। কখনও ভিক্ষা করে বাসে; ভিন্ন গ্রামের মানুষ, এখানে নতুন। দোকানের বাইরে বাঁশের বেঞ্চিতে ঘুমায়। গুঙ্গিকে লক্ষ্য করেছে শমসের। ঝোপের আড়ালে গিয়ে সে গুঙ্গিকে জাপটে ধরে। গুঙ্গি বাধা দেয় না। আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়।

পরদিন গুঙ্গি আবার আসে। শমসেরের ইশারায় আবার ঝোপের আড়ালে যায়। বিয়েবাড়িতে ব্যস্ততা বাড়ে; আর গুঙ্গি যায় অভিসারে। শমসের জাপটিয়ে ধরে ঘাসের উপরে শোয়ায় গুঙ্গিকে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। অসমাপ্ত উত্তেজনায় দুজনেই হাঁপাতে থাকে।

বিয়ের রাতে সবাই যখন ব্যস্ত, গুঙ্গি নিজের কাপড় আর হালিদার কাপড় নিয়ে চলে আসে বড় রাস্তার ধারে। শমসেরের হাত ধরে শহরে যাবার শেষ বাসে উঠে বসে।

****

শহরের বাস-ডিপোতে নামে দুজনে। রাস্তার ধারের দোকানগুলোর পেছনে একটা ঝুপড়ি দেখতে পায়। দুই দিক খোলা পরিত্যক্ত দোকানে শুয়ে থাকে। সকালে দুজনে কাছের রেল-ষ্টেশনে যায়। বাইরের দোকানগুলোতে ফাইফরমাশের কাজ খোঁজে শমসের। অনেক কাকুতি মিনতির পর, গুঙ্গিকে দেখিয়ে এক মালিকের দুমড়ে পড়া ঝুপড়িতে গিয়ে ওঠে শমসের ওকে নিয়ে। কুড়িয়ে আনা বাঁশ দিয়ে উচু করে তুলে দেয় ঝুপড়ির নেমে পড়া চাল, কুড়িয়ে পাওয়া চট দিয়ে ঢেকে দেয় সামনের খোলা অংশ। কিছু কিনে, কিছু চেয়েচিন্তে যোগাড় করা খাবার খেয়ে দুজনে অন্ধকার, জীর্ণ ঘরে প্রথম বাসর পাতে। কোনো বাধা, অসুবিধাই একজোড়া নারী-পুরুষকে বিরত করতে পারে না সঘন মিলন থেকে। একজন জীবনের সব আনন্দে বঞ্চিত তৃষিত কিশোরী, আর একজন চালচুলোহীন বুভুক্ষু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দেহসুধা পানে বিভোর হয়ে উঠে।

গুঙ্গি অবাক হয় খাওয়া, থাকার করুণ অবস্থা দেখে। এরকম সে আগে দেখেনি। ক'দিন পরে গুঙ্গি দোকানদারদের রান্না করে দেওয়ার বিনিময়ে দুজনের খাবার পায়। শমসের ফাইফরমাস খেটে সামান্য রোজগার করতে সমর্থ হয়। বহু কষ্টে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে জীর্ণ ঘরে সংসার পাতে গুঙ্গি। এসব গুঙ্গির আগের জীবনের চাইতে অনেক দরিদ্র, অনেক ক্ষুদ্র। তবু আলোবাতাসহীন এই স্থান নিজের সংসার বলেই ওর বড় আপন মনে হয়।

আক্ষরিক অর্থে ভাসতে ভাসতে শমসের এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে গিয়ে ভেড়ে, কোথাও স্থিতি হয় না। জ্ঞান হবার পর থেকেই তার জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে শুধু তিন বেলার খাবার যোগাড় করতে, আর লজ্জা ঢাকার জন্য সামান্য কাপড়ের যোগাড় করতে। শীতের দিনের ন্যূনতম চাদর, কাঁথা হলেই সে কৃতার্থ হয়ে যেত। বাসস্থানের সামর্থই হয়নি কোনদিন। এতদিন এসব ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। পেটের ক্ষুধার সাথে দেহের ক্ষুধাও ছিল বইকি। কিন্তু তার মতো সহায়-সম্বলহীন মানুষের পক্ষে যে বিয়ে করা সম্ভব নয়, তা সে মেনে নিয়েছিল। এমত অবস্থায় সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো এক কিশোরী বিনা আয়েসে টুপ করে তার হাতের নাগালে এসে পড়ল। হোক না তার বিকৃত মুখ। শমসের এই সৌভাগ্যকে প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করে। দিনের বেলা, এমনকি রাতের বেলাও গুঙ্গির মুখ দেখার দরকার হয় না, ইচ্ছাও হয় না। দিন'ভর সে নানাভাবে ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে। গুঙ্গি সমস্ত মনপ্রাণ ও দরদ দিয়ে সংসার পাততে চায়। বাপের বাড়িতে এতদিন থাকা খাওয়ার কষ্ট বোঝেনি। এখন সেটাই ঘোর বাস্তব।

প্রথম যৌবনের উন্মাদনা কমে এলে ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অসুবিধাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। খোলা আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর গুঙ্গিকে আকুলভাবে ডাক দেয়। গুঙ্গি নানাভাবে শমসেরকে বলবার চেষ্টা করে। হাত-পা নেড়ে, বাইরে আকাশ

দেখিয়ে, মাঠের দিকে আঙ্গুল তুলে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে। শমসেরও কাজে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না, তাই গুঙ্গির অস্থিরতা দেখে একদিন পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে দুজনে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে পড়ে। তারপর বিভিন্ন ট্রেনে উঠে-নেমে, কখনো স্টেশনের ভিতরে, কখনও বাইরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে কয়েকদিন পর ঢাকা স্টেশনে এসে পৌঁছায়। তিন-চার দিনের সফরে সামান্য সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলে ট্রেনে, স্টীমারে এবং স্টেশনে শমসের ও গুঙ্গি দুইজনেই মাঝে মাঝে যাত্রীদের কাছে হাত পাতে। শমসেরের নজর এড়ায় না যে গুঙ্গি বরাবরই ওর চাইতে বেশি ভিক্ষা পায়। সম্ভবত গুঙ্গির মুখের দিকে তাকানো এড়াবার জন্যই লোকে তাড়াতাড়ি কিছু দিয়ে দেয়।

বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত শমসের আর গুঙ্গি ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে এসে ঠেকে। রেললাইনের ধারে বহুদূর পর্যন্ত ঘন বস্তি গড়ে উঠেছে। আগে রেললাইনের এক ধারে বস্তি ছিল, এখন অন্য ধারেও ঝুপড়ি গজিয়ে উঠছে। বস্তির লোকজনের কাছ থেকে খবর নিয়ে, ওদের সাহায্যেই শমসের দিনমজুরের কাজ যোগাড় করে। বস্তির ঘরের মাঝখানে চটের পর্দা দিয়ে এক টুকরো শোবার জায়গা করা হয়। বারোয়ারি রান্নার ব্যবস্থা, বারোয়ারি পানির ব্যবস্থা। গোসল ব্যবস্থা আরও করুণ। শমসের ও গুঙ্গি দুজনেই ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, তাই আপাতত এখান থেকে নড়ার চিন্তা করে না ওরা। সামান্য হলেও শমসের নিয়মিত উপার্জন করছে। তার সবটা মনোযোগ যায় ভাল শোবার ব্যবস্থার দিকে। কিছুদিন পর শমসের একটা ঘর আর লাগোয়া ছোট রান্নাঘরের ব্যবস্থা করে। কিছু বিছানাপত্র, এমনকি একটা চৌকি পর্যন্ত যোগাড় করে ফেলে।

বস্তির চারদিকে দুর্গন্ধ, আবর্জনা, ময়লা-জমা পানি – এসবে অভ্যস্ত হতে গুঙ্গির দারুণ কষ্ট হয়। তারপর কথা না বলতে পারার দুর্ভোগ। তবুও এই অশিক্ষিত, গরিব, নোংরা, ঝগড়াটে মানুষগুলো গুঙ্গির কুৎসিত মুখ আর কথা বলার অপারগতাকে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করে। অল্পবয়সী মেয়েটি যে এই পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হতে পারছে না, তাও তারা বুঝতে পারে। কেউ কেউ গুঙ্গিকে ওদের সঙ্গে কাজে যেতে ডাকে। কিন্তু গুঙ্গির বিকৃত মুখ আর তার কথার গোঙানির জন্য সে কাজ পায় না। অনেক চেষ্টায় ইঁট ভাঙার কাজ পায় আরেক মহিলার সহকারী হয়ে, আর তারই কথামতো মানুষ দেখলে সে মুখ ঢেকে ফেলে।

বছর তিনেকের মাথায় গুঙ্গি অন্তঃসত্ত্বা হয়। খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে সে। ওরা দুজনই শঙ্কিত হয় আসন্ন বাচ্চা গুঙ্গির মতো না হয়! সকলের আশঙ্কা মিথ্যা করে দিয়ে যথাসময়ে গুঙ্গির একটি ছেলে হয়। শিশুটির সুন্দর মুখের দিকে গুঙ্গি অপলকে তাকিয়ে থাকে। শিশুটি ওর নিজের! একান্তই নিজের! কী অপরূপ সুন্দর! এতদিনে নিজের ভাগ্যকে যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে তার। যেন বিশ্বাস করতে পারে না এত বড় একটা উপহার তার ভাগ্যে তোলা ছিল। শমসেরও চমৎকৃত হয়। ছেলেকে বুকে তুলে নিলে তার মনেও দোলা লাগে। সন্তানকে কোলে নিয়ে গুঙ্গি জগৎ সংসার ভুলে যায়। ছেলেকে রেখে বাইরে কাজে যেতে মন চায় না। শমসেরের কাজ বেড়ে যায়। দুজনের মিলিত আয়ে সামান্য যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বস্তি এসেছিল সেটুকুও বিলীন হতে শুরু করে। বস্তির মহিলাদের পরামর্শে আর সাহায্যে ছেলে কোলে করেই গুঙ্গি কাজে যেতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই গুঙ্গি বুঝতে পারে তার শরীরে আরেকটি প্রাণের আভাস। খুশি আর অখুশির মধ্যে দোদুল্যমান থাকে সে। শমসের অখুশি হয়, চিন্তিত হয়। সেই চিরন্তন টানাপোড়েনের যুদ্ধ। দুবেলা পেট পুরে খাওয়া, থাকার জন্য ছোট্ট একটু জায়গা আর সামান্য কিছু বস্ত্র – সংখ্যাবৃদ্ধি হলে সে সামলাবে কী করে?

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় গুঙ্গি তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পারে। এক অন্ধকার ঘরে, নোংরা পরিবেশে সন্তানের জন্মের সময় মনে আগের কথা ভেসে আসে। গুঙ্গিদের গ্রামে সে দেখেছে বাচ্চা হবার আগে মায়েদের কত আদর-যত্ন। সে নিজেই তো কতবার দৌড়াদৌড়ি করে গরম পানি, পরিষ্কার কাপড়, কাঁথা, খাবার পৌঁছে দিয়েছে সদ্য প্রসূতির কাছে। আর সে সমস্ত ঘর মাটির হলেও, কত পরিষ্কার ছিল। পাড়ায় পানির কল ছিল, বাড়ির সাথে পুকুর ছিল! এখানে বস্তির মহিলারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তবু কোথায় সেই গ্রামের পরিচিত জগৎ! গুঙ্গি আস্তে আস্তে মুষড়ে পড়ে।

এবার সুন্দর একটি মেয়ে হয়। গুঙ্গি আগের বারের মতো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না। অহরহ তার মনে পড়ে নিজের গ্রামের কথা। দুর্বল শরীর নিয়ে ঘরের কাজ আর দুটো বাচ্চা

সামলায় বহু কষ্টে। শমসের সুযোগমতো হাত লাগায় ঘরকন্নার কাজে। প্রয়োজন বেড়ে গেছে আগের চাইতে অনেক বেশী। পয়সা উপার্জনের জন্য শমসেরকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় আরো কাজের খোঁজে।

গুঙ্গি প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে ছটফট করে। ছোট্ট, অন্ধকার ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। বাতাস দুর্গন্ধে ভরা। গুঙ্গি ছেলের হাত ধরে, মেয়েকে কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ঝুপড়ির বাইরে নোংরা, আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়েই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন কী করবে সে? এখনও কি সে ফিরে যেতে পারবে গ্রামে? ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারবে? আর তার নিজের ক্ষুধা? আশাহত, ভগ্ন হৃদয়ে সে খোলা আকাশে উত্তর খুঁজতে থাকে।

****

একদিন গুঙ্গি লুকিয়ে চলে গেল জেবুন্নেছার সংসারে; তাতে হাশেম ও রোকেয়ার মনে বিষাদ নেমে আসে। হতভাগী মেয়েটি যে শুধু তাদের মুখই পুড়িয়েছে তাই নয়, তার নিজের জীবনও অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় কারণটির জন্য কেউ রাগ করতে পারে না গুঙ্গির উপর। রাগে, দুঃখে, অসহায়তায় স্বীকার করে দায়ী শুধু তারাই। তাদের অবহেলা আর অজ্ঞতাই গুঙ্গির এই পরিণতির জন্য দায়ী। প্রথম প্রথম বিভিন্ন জায়গায় তাকে খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছিল বাড়ির লোকজন; আস্তে আস্তে তাও কমে আসে। জেবুন্নেচ্ছার বুক মুচড়ে ওঠে। রোকেয়ার ঘুম ভেঙে যায়। দুচোখ ভরে আসে পানিতে। স্বপ্ন দেখে, দুঃস্বপ্ন। এমনই এক দুঃস্বপ্নের রাতে রোকেয়া দরজা খুলে বাইরে আসে। খোলা আকাশে শেষ তারাটি যাব যাব করছে, সুবেহ সাদেক! বাইরে জেবুন্নেছা দাওয়ায় খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে নির্মল, সুন্দর বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনিও উত্তর খুঁজছেন! তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বুক দিয়ে আগলিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না! রোকেয়া উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকায়, বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে!

অনেক দূরে, ঢাকার অভিজাত পল্লীতে ভোরবেলা উঠে ডাক্তার ইকবাল দোতালার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। দূর আকাশের দিকে তাকান। ভোরের আকাশে প্রথম সূর্য; আকাশ ফরসা হয়ে আসছে, আকাশের একপাশে লাল আভা। ইকবাল বরাবরই ভোরে ওঠেন। আজ আরও আগে উঠেছেন। আজ তিনি যোগ দেবেন ক্লেফট প্যালেটের সার্জারিতে। তাঁদের কয়েকজন ডাক্তারের নিরন্তর চেষ্টায় বিদেশ থেকে ডাক্তার আনা হয়েছে। যাঁদের দুজন বিনাপয়সায় সেবা ও শিক্ষাদান করেছেন অপারেশনের জন্য। তাঁরাও জানেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এখনো এই চিকিৎসা সহজলব্ধ নয়। ডাক্তার ইকবাল আর তাঁর সহযোগীরা নিজেদের সময়, উৎসাহ নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছেন এই চিকিৎসার সুযোগের কথা। ইকবাল কোনদিন ভুলতে পারেননি তাঁর চাচীর ভাইয়ের ৪ বছর বয়সী সেই অসহায় মেয়েটির মুখ; গোঙানির শব্দে তার তীব্র প্রতিবাদ, জিনিসপত্র ছোঁড়া, দেওয়ালে মাথা খোঁড়া! তার দুঃখজনক অসহায়তা!

গত বছর তিনি অনেক আশা নিয়ে সেই গ্রামে গিয়ে শোনেন যে মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেছে! ডাক্তার ইকবাল ভীষণভাবে আশাবাদী যে এখন থেকে এই ধরনের চিকিৎসার সুযোগ গরিব দেশেও পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে বয়স্কদেরও অপারেশন করে ঠিক করা যাবে। এই চিকিৎসা তাঁর দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই তাঁদের সাধনা।

যে মেয়েটি তাঁর এই কাজের অনুপ্রেরণা, সেই মেয়েটি যদি এখন জন্মাত! যদি তার জন্মের ২০-২৫ বছর পরে জন্মাত সে, তাহলে হয়তো – হয়তো বা...!

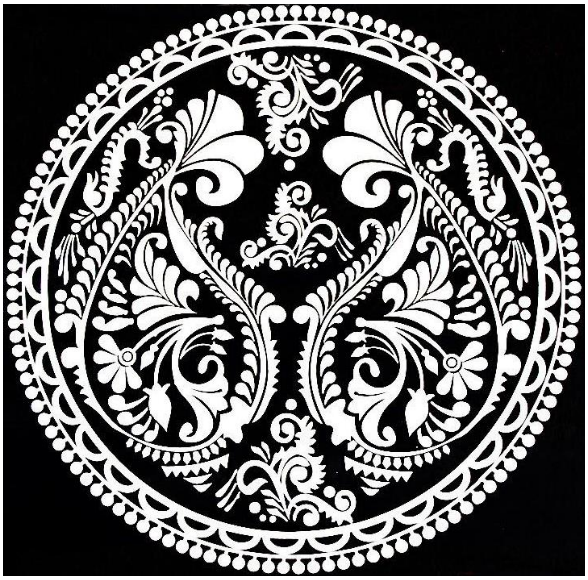

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৯ (2022)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word-**এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) ‘প্রবাস বন্ধু’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর এক মাস আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ
নববর্ষ